POSTAL REG NO GDP- 43 / 2023--2025

আল্লাহ্‌র বাণী

قَالَ هٰذَا رَحْمَةٌ مِّنْ رَّبِّيْ ۚ
فَإِذَا جَآءَ وَعْدُ رَبِّيْ جَعَلَهٗ دَكَّآءَ ۚ
وَكَانَ وَعْدُ رَبِّيْ حَقًّا

সে বলিল,‘ ইহা আমার প্রতিপালকের তরফ হইতে বিশেষ অনুগ্রহ। অতঃপর, যখন আমার প্রতিপালকের প্রতিশ্রুতি পূর্ণ হওয়ার সময় আসিবে তখন তিনি উহাকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করিয়া দিবেন। এবং আমার প্রতিপালকের প্রতিশ্রুতি নিশ্চয় সত্য।

(সূরা কাহফ:৯৯)

بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى عبده المسيح الموعود
وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللّٰهُ بِبَدْرٍ وَّاَنْتُمْ اَذِلَّةٌ

খণ্ড 8

বদর

সাপ্তাহিক কাদিয়ান

Weekly BADAR Qadian Bangla

সংখ্যা 48

সম্পাদক: তাহের আহমদ মুনির

সহ-সম্পাদক: মির্যা সফিউল আলাম

www.akhbarbadarqadian.in

বৃহস্পতিবার 30 Nov, 2023 15 জামাদিউল আওয়াল 1445 A.H

আহমদীয়া সংবাদ

সৈয়্যদনা হযরত আমীরুল মোমিনীন খলীফাতুল মসীহ আল খামেস (আইঃ) আল্লাহ্‌র কৃপায় কুশলে আছেন। আলহামদো লিল্লাহ। জামাতের সদস্যদের নিকট হুযূর আনোয়ারের সুসাস্থ্য ও দীর্ঘায়ু এবং হুযুরের যাবতীয় উদ্দেশ্যাবলী পূর্ণ হওয়ার জন্য ও তাঁর সুরক্ষার জন্য দোয়ার আবেদন রইল। আল্লাহ তা'লা সর্বদা হুযুরের রক্ষক ও সাহায্যকারী হউক। আমীন।

রসুলুল্লাহ্ (সা.)-এর বাণী

পথের অধিকার

২৪৬৫) হযরত আবু সাঈদ (রা.) নবী (সা.) এর পক্ষ থেকে বর্ণনা করেছেন যে, আঁ হযরত (সা.) বলেছেন: দেখো রাস্তায় যেন না বসো। সাহাবাগণ বলেন, আমাদের তো তা ছাড়া কোন উপায় নেই, সেটাই তো আমাদের বসায় জায়গা, যেখানে আমরা বসে কথাবার্তা বলি। আঁ হযরত (সা.) বললেন: রাস্তাতেই যদি বৈঠক করতে হয় তবে পথের অধিকার দিবে। তাঁরা প্রশ্ন করেন, পথের অধিকার কি? আঁ হযরত (সা.) বললেন: দৃষ্টি অবনত রাখা, কষ্টদায়ক বস্তুকে পথ থেকে সরিয়ে দেওয়া, সালামের উত্তর দেওয়া, সৎ কাজের উপদেশ দেওয়া এবং অসৎ কাজ থেকে বিরত রাখা।

পথ থেকে কষ্টদায়ক বস্তু সরিয়ে দেওয়া

২৪৭২) হযরত আবু হুরাইরাহ (রা.) এর পক্ষ থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, নবী করীম (সা.) বলেছেন: একবার এক ব্যক্তি রাস্তায় হেঁটে যাচ্ছিল। সে রাস্তার মধ্যে কাঁটাযুক্ত একটি ডাল দেখতে পেয়ে সেটি সেখান থেকে সরিয়ে দেয়। আল্লাহ্ তা'লা তার সেই কাজ সমাদরের দৃষ্টিতে দেখেছেন এবং তার দোষত্রুটি ঢেকে দিয়ে তার পাপসমূহ ক্ষমা করে দেন।

মোমেন মোমেন হতে পারে না

২৪৭৫) হযরত আবু হুরাইরাহ (রা.) এর পক্ষ থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, নবী করীম (সা.) বলেছেন: ব্যাভিচারী যখন ব্যাভিচার করে তখন সে মোমেন হয় না আর যখন সুরা পান করে তখন পান করে তখন মোমেন থাকা অবস্থায় সুরা পান করে না আর যখন সে চুরি করে তখন মোমেন থাকা অবস্থায় চুরি করে না এবং যখন সে লুণ্ঠন করে তখন মোমেন থাকা অবস্থায় এমন বস্তুও লুণ্ঠন করে না যার দিকে মানুষের লোলুপ দৃষ্টি যায়।

(সহীহ বুখারী, কিতাবুল মাযালিম)

এই সংখ্যায়

খুতবা জুমা, প্রদত্ত, ৬ই অক্টোবর ২০২৩
হুযুর আনোয়ার (আই.) এর অনলাইন সাক্ষাত
জলসা সালানায় প্রদত্ত ভাষণ

চাহিদাবলীর সম্মুখীন হন যাতে খোদার প্রতি সমর্পনের দৃষ্টান্ত স্থাপন হয়, যাতে আবু বকর এর ন্যায় আত্মনিবেদিত জীবনের দৃষ্টান্ত প্রকাশ্যে আসে এবং পৃথিবীতে সর্বশক্তিমান খোদার অস্তিত্বের প্রতি ঈমান বিকশিত হয় এবং খোদার প্রতি সমর্পিত ব্যক্তিরা জগতের জন্য আল্লাহ্‌র নিদর্শন হিসেবে পরিগণিত হয়

হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ)-এর বাণী

আম্বিয়া (আ.) কেন বিভিন্ন প্রকারের চাহিদাবলীর সম্মুখীন হন?

আমি এখানে একটি জরুরী বিষয় বর্ণনা করতে চাই। আম্বিয়া (আ.) কেন বিভিন্ন প্রকারের চাহিদাবলীর সম্মুখীন হন? আল্লাহ্ তা'লা এ বিষয়ে কুদরত রাখেন তাদেরকে কখনও এমন পরিস্থিতিতে না ফেলতে যেখানে কোন প্রকার চাহিদার সম্মুখীন হতে হয়। কিন্তু তারা চাহিদাবলীর সম্মুখীন হন যাতে খোদার প্রতি সমর্পনের দৃষ্টান্ত স্থাপন হয়, যাতে আবু বকর এর ন্যায় আত্মনিবেদিত জীবনের দৃষ্টান্ত প্রকাশ্যে আসে এবং পৃথিবীতে সর্বশক্তিমান খোদার অস্তিত্বের প্রতি ঈমান বিকশিত হয় এবং খোদার প্রতি সমর্পিত ব্যক্তিরা জগতের জন্য আল্লাহ্‌র নিদর্শন হিসেবে পরিগণিত হয় এবং সেই লুক্কায়িত ভালবাসা ও সুখানুভবের বিষয়ে জগতবাসী অবগত হয়, যার সামনে অর্থ-সম্পদের ন্যায় প্রিয় ও লোভনীয় বস্তুও অনায়াসে এবং সানন্দে বিসর্জন দেওয়া যায়। অতঃপর অর্থ-সম্পদ ব্যায়ের পর খোদার প্রতি সমর্পনকে পরিপূর্ণতা দানের জন্য সেই শক্তি ও সাহস অর্জিত হয় যা মানুষকে প্রাণের ন্যায় প্রিয় বস্তুকেও খোদার পথে উৎসর্গ করে দিতে কুণ্ঠিত হয় না।

বস্তুত আম্বিয়াগণ (আ.) যে চাহিদাবলীর সম্মুখীন হন, এর প্রকৃত উদ্দেশ্য জগতের মিথ্যা ভালবাসা এবং লয়শীল বস্তুসমূহ থেকে বিমুখ হওয়ার শিক্ষা দেওয়া এবং আল্লাহ্ তা'লার অস্তিত্বের উপর ঈমানের আনন্দ সৃষ্টি করা এবং মানবজাতির কল্যাণ ও হিতৈষার জন্য আত্মত্যাগের শক্তি সৃষ্টি করা। অন্যথায় এই পবিত্র দলটি সেই অধিশ্বরের নির্দেশে পরিচালিত হয়, যাঁর হাতে আকাশ ও পৃথিবীর ভাণ্ডার রয়েছে। তাঁর আবার কোন কিছুর কিসের প্রয়োজন হতে পারে? সেই চাহিদাবলীর প্রয়োজন হয় শিক্ষাকে পরিপূর্ণতা দান এবং মানুষের মধ্যে নৈতিকতা ও ঈমানকে দৃঢ়তা দানের উদ্দেশ্যে।" (মালফুযাত, ১ম খণ্ড, পৃ: ৪৯৯)

একজন পণ্ডিতামন্য ব্যক্তির জন্য নতুন কোন শিক্ষা মেনে নেওয়া কঠিন হয়ে থাকে। তাই তো কাফেরদের হৃদয় পরিস্কার ফলকের মত হওয়ার কারণে তারা দ্রুত ঈমান এনেছিল। কিন্তু ইহুদী ও নাসারা এর থেকে বঞ্চিত থাকে, যাদের কাছে ইতিপূর্বেই খোদার বাণী ছিল।

সৈয়্যদানা হযরত মুসলেহ মওউদ সূরা কাহফ এর ৬৯-৭০ নং আয়াত

وَكَيْفَ تَصْبِرُ عَلٰى مَا لَمْ تُحِطْ بِهٖ خُبْرًا ○ قَالَ سَتَجِدُنِيْٓ اِنْ شَآءَ اللّٰهُ صَابِرًا وَّلَآ اَعْصِيْ لَكَ اَمْرًا

এর ব্যাখ্যায় বলেন:

এই আয়াতে এই বিষয়ের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, মুসবী সেলসেলার মানুষদের জন্য মহম্মদী জ্ঞান অনুধাবন করা সত্যিকার অর্থেই কঠিন হবে। কেননা, এই ধর্মে অনেক কিছুই নতুন শিক্ষা বর্ণিত হবে। আর একজন পণ্ডিতামন্য ব্যক্তির জন্য নতুন কোন শিক্ষা মেনে নেওয়া কঠিন হয়ে থাকে। তাই তো কাফেরদের হৃদয় পরিস্কার ফলকের মত হওয়ার কারণে তারা দ্রুত ঈমান এনেছিল। কিন্তু ইহুদী ও নাসারা এর থেকে বঞ্চিত থাকে, যাদের কাছে ইতিপূর্বেই খোদার বাণী ছিল। কেননা তারা ইসলামের যা কিছু তাদের ধর্মীয় গ্রন্থের পরিপন্থী দেখতে পেত, আর তা দেখে তাদের ধৈর্য বাঁধন হারা হতে চাইত। এর ফলে তারা পরীক্ষার সম্মুখীন হয়েছে। হরত মসীহর যুগেও এই কারণেই ইহুদী জাতি হিদায়াত থেকে বঞ্চিত ছিল অপরদিকে অন্যান্য জাতিরা পিড়াপিড়ী করে এই ধর্মের অন্তর্ভুক্ত হতে থাকে।

৭০ নম্বর আয়াতের ব্যাখ্যায় হুযুর (রা.) বলেন: মূসা বললেন, তুমি আমাকে ধৈর্যশীলদের মধ্যে পাবে এবং আমি তোমার আদেশ অমান্য করব না। এই আয়াত থেকে প্রকাশ পায় যে, এটি একটি স্বপ্ন ছিল। কেননা, হযরত মূসা একজন স্থায়ী নবী ছিলেন, আর তিনি অন্য কাউকে, সে যেইহ হোক না কেন, একথা বলতে পারতেন না যে,আধ্যাত্মিক বিষয়াদিতে আমি তোমার আদেশাবলী মেনে চলব।

এই আয়াতে এই বিষয়ের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, মূসা (আ.)-এর জাতির মধ্য থেকে যারা মহম্মদ রসুলুল্লাহ্ (সা.) এর যুগ পাবে, তাদের জন্য মহম্মদ রসুলুল্লাহ্ (সা.) এর আনুগত্য করা অনিবার্য হবে। এই হাদীসের শব্দগুলি এ বিষয়ের প্রতিই ইঙ্গিত করছে।

لَوْ كَانَ مُوْسٰى وَ عِيْسٰى حَيَّيْنِ لَمَا وَسِعَهُمَا اِلَّا اتِّبَاعِيْ

(ইবনে কাসীর, ২য় খণ্ড, পৃ: ২৪৬)

যদি মূসা (আ.) এবং ঈসা (আ.) ও জীবিত থাকতেন, তবে তাঁরাও আমার অনুবর্তিতা করতেন।

(তফসীর কবীর, ৪র্থ খণ্ড, পৃ: ৪৭৬)

প্রিন্টার ও পাবলিশার জামিল আহমেদ নাসের ফজলে উমর প্রিন্টিং প্রেস কাদিয়ান থেকে মুদ্রণ করে আখবার বদর কাদিয়ান অফিস থেকে প্রকাশ করছে: প্রো: তত্বাবধায়ক, বদর বোর্ড কাদিয়ান

বর্তমান আধুনিক সমাজে মুসলমান নারী হিসেবে জীবন যাপন

যুক্তরাজ্যের লাজনা ইমাইল্লাহ্‌র সালানা ইজতেমায় (২০১৯) হুযুর আনোয়ার (আই.) ভাষণ

লাজনা ইমাইল্লাহ্ হলো আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের ১৫ বছরের বেশি বয়সী নারী সদস্যাদের সমন্বয়ে গঠিত একটি অঙ্গ-সংগঠন। এই সংগঠনটি আহমদী মুসলমান নারীদের আত্মবিশ্বাস তৈরি ও নতুন প্রতিভা বিকাশের লক্ষ্যে এবং দৃঢ় সম্পর্ক গড়ে তোলার উদ্দেশ্যে তাদের নিজস্ব পরিমণ্ডলে বিভিন্ন কার্যক্রম, অনুষ্ঠান এবং সভার আয়োজন করে থাকে। সর্বোপরি, এটি আধ্যাত্মিকতা, শিক্ষা এবং ধর্মের সেবার জন্য একটি অনুকূল পরিবেশ তৈরি করে। প্রতি বছর লাজনা ইমাইল্লা বিশ্বজুড়ে জাতীয় পর্যায়ে বিভিন্ন অনুষ্ঠানের আয়োজন করে থাকে। যুক্তরাজ্যে হ্যাম্পশায়ারের কিংসলে-এর কান্ট্রি মার্কেটে গত ১৫ সেপ্টেম্বর ২০১৯ তারিখে ৪১তম জাতীয় ইজতেমা (ধর্মীয় সম্মেলন) অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানটিতে ৫৮০০জন উপস্থিত ছিলেন এবং সমাপনী অধিবেশনে যোগদান করেন আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের বিশ্বপ্রধান, প্রতিশ্রুত মসীহ্ (আ.)-এর পঞ্চম খলীফা হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.)।

তাশাহুদ, তাআব্বুয ও সূরা ফাতেহা পাঠের পর, হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আল-খামেস (আই.) বলেন:

"আল্লাহ্ তা'লার রহমতে আজ আপনারা এই বছরের ইজতেমার সমাপ্তিতে পৌঁছে গেছেন।

আলহামদুলিল্লাহ্, জামা'তের (আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত) ধারাবাহিক অগ্রগতির পাশাপাশি, লাজনা ইমাইল্লাহ যুক্তরাজ্য গত কয়েক বছরে অনেক পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। এর সদস্যাগণের এবং সাংগঠনিক কার্যক্রমের উভয় দিক দিয়েই লাজনা ইমাইল্লাহ্ উন্নতি করেছে এবং সাম্প্রতিক বছরগুলোতে অনেক উপকারী প্রকল্প গৃহীত হয়েছে এবং বহু অনুষ্ঠান পালিত হয়েছে।যাইহোক, সাফল্য এবং সমৃদ্ধির দিকে অগ্রসর হওয়ার সাথে সাথে, সত্যিকার ইসলামী মূল্যবোধ এবং মুসলমান হিসেবে আমাদের মূল পরিচয় রক্ষার এবং সংরক্ষণের জন্য আমাদের প্রচেষ্টা আরও জোরদার করা অপরিহার্য।

এটি অর্জনের একমাত্র উপায় হলো, আমাদেরকে পূর্বের চেয়ে বেশি প্রচেষ্টা চালাতে হবে এবং ইসলামের শিক্ষার ওপর আমল করতে হবে।প্রতিশ্রুত মসীহ্ (আ.) এর আকাঙ্ক্ষা ও প্রত্যাশা পূরণের জন্য আমাদেরকে এমনকি পূর্বের চেয়েও বেশি প্রচেষ্টা অবশ্যই চালানো উচিত। তিনিই সেই ব্যক্তি, যাকে ইসলামের গৌরবময় এবং মহান শিক্ষা পুনরুদ্ধার করার জন্য সর্বশক্তিমান আল্লাহ্ তা'লা প্রেরণ করেছিলেন। বিগত শতাব্দীগুলোতে মুসলমানদের মাঝে তাদের ইসলামী ধর্ম-বিশ্বাসের বাস্তব প্রকাশের ক্ষেত্রে ধীরে ধীরে কলুষতার প্রবেশ হতে দেখা যায়। তিনিই সেই ব্যক্তি, যাকে পাঠানো হয়েছিল সেসব দুর্বলতা দূর করার জন্য।মুসলমানদের মধ্য থেকে হারিয়ে যাওয়া ইসলামী মূল্যবোধগুলো পুনরুদ্ধার করার পাশাপাশি, পৃথিবীর কোণায় কোণায় ইসলামের বাণী পৌঁছে দেওয়ার জন্য এবং সকল ধর্ম ও বিশ্বাসের মানুষদেরকে পবিত্র কুরআনের অতুলনীয় ও সর্বজনীন শিক্ষায় আলোকিত করার জন্যও তাকে প্রেরণ করা হয়েছিল। এই কারণেই প্রতিশ্রুত মসীহ্ (আ.) বলেছিলেন যে, তার যুগ ছিল ইসলামের সঠিক শিক্ষার প্রচারের যুগ।আমরা গর্বের সাথে নিজেদেরকে তাঁর অনুগামী বলে দাবি করি এবং তাই অন্যদেরকে অবহিত করা আমাদের একান্ত কর্তব্যে, ইসলামের খাঁটি শিক্ষাগুলোকে গ্রহণ করাই বৃহত্তর বিশ্বের জন্য মুক্তি ও সৌভাগ্যের মাধ্যম। ইসলামের শিক্ষাসমূহ যে আমাদের হৃদয়ের মাঝে সত্যিকারের মানসিক প্রশান্তি ও সন্তুষ্টি অর্জনের মাধ্যম, তা নিজেদের জীবনের মাধ্যমে তুলে ধরাই আমাদের নৈতিক দায়িত্ব ও আজীবনের ব্রত।

কিছু লোক যুক্তি দেখাবেন যে, ইসলামই তো বিশ্বব্যাপী ছড়িয়ে পড়েছে এবং বিশ্বের কী উপকার হয়েছিল বা এখন হয়েছে, তা তারা সন্ধান করবে। সর্বোপরি, বলা হয়ে থাকে যে, বিশ্বে প্রায় ১৮০ কোটি মুসলমান রয়েছে এবং তাদের মধ্যে হাজার হাজার আলেম রয়েছেন, যারা ইসলামী শিক্ষার প্রসারের দাবি করেন। তবুও মুসলিম উম্মাহর (বৃহত্তর মুসলিম সম্প্রদায়) মাঝে কিংবা বৃহত্তর বিশ্বে সত্যিকারের শান্তি ও সমৃদ্ধির পথে এটি পরিচালিত করে নি।এর সহজ ও সুস্পষ্ট কারণ হলো, প্রতিশ্রুত মসীহ্ (আ.)-কে গ্রহণকারী সেসব আশিসমণ্ডিত লোকেরা ছাড়া বিশ্বজুড়ে মুসলমানরা নানা ভাগে চরমভাবে বিভক্ত এবং ইসলামের শিক্ষাগুলোকে তারা এমনভাবে ব্যাখ্যাকরে, যেসব ব্যাখ্যা অর্থহীন এবং প্রায়শই যেগুলো অনুসরণ করা অসম্ভব।বাস্তবতা হলো, সর্বশক্তিমান আল্লাহ্ তা'লা প্রতিশ্রুত মসীহ্ (আ.)-কে মহানবী (সা.)-এর প্রতি অবতীর্ণ নির্ভুল শরীয়তের প্রচার ও পুনঃপ্রতিষ্ঠার জন্য প্রেরণ করেছিলেন। আমরা সেই ভাগ্যবান ব্যক্তি, যারা যুগইমামের (আ.) আহ্বান শুনেছি এবং গ্রহণ করেছি এবং তিনি আমাদেরকে যা শিখিয়েছিলেন তা অনুশীলনের এবং প্রচারের দায়িত্ব আমাদের।এই মহান উদ্দেশ্য পূরণের ক্ষেত্রে সর্বশক্তিমান আল্লাহ্ আমাদেরকে বঞ্চিতকরেন নি কিংবা শক্তি-সামর্থ্য ও উপকরণবিহীন করেও রাখেন নি; বরং, তিনি এই যুগে ইসলামের প্রচারের জন্য বিভিন্ন উপায় ও পথ উন্মুক্ত করেছেন। আজকের বিশ্বে টেলিভিশন, রেডিও, ইন্টারনেট, মুদ্রণ মাধ্যম এবং সামাজিক-যোগাযোগ-মাধ্যম কেবল কয়েকটি উপায়, যেখানে যোগাযোগ ব্যবস্থা এমন পর্যায়ে পৌঁছেছে যে, তাৎক্ষণিকভাবে বিশ্বব্যাপী যোগাযোগ করা সম্ভবপর হচ্ছে।

এগুলোই হলো সে-সমস্ত প্রযুক্তি যা আমরা জামা'ত হিসেবে ইসলামের শিক্ষা প্রচারের জন্য ব্যবহার করছি। তবে, অন্যের কাছে ইসলামের বাণী পৌঁছে দেওয়ার জন্য কেবল এগুলোই যথেষ্ট নয়; বরং আমাদের উদ্দেশ্য কখনই পরিপূর্ণ হতে পারেনা, যতক্ষণ পর্যন্ত না আমাদের প্রত্যেকে ইসলামের সুমহান শিক্ষার জীবন্ত ও বাস্তব উদাহরণ হয়ে উঠতে পারি। একারণেই প্রতিশ্রুত মসীহ্ (আ.) বার বার তার জামা'তের সদস্যদেরকে ইসলামী মূল্যবোধ অনুসারে জীবনযাপন করার এবং নিজ-জীবনে এর শিক্ষা রূপায়িত করার প্রয়োজনীয়তার কথা বলেছেন।আমার আরও যোগ করা উচিত যে, এই আধুনিক প্রযুক্তিগুলো শুধু আমরাই ব্যবহার করছি- এরকম দাবি আমরা করতে পারি না। বরং, ইহজাগতিক লোকেরা তাদের অনুষ্ঠানসমূহ এবং আধেয় সম্প্রচারের ক্ষেত্রে যোগাযোগের নিত্যনতুন কোনো উপায়ই বাদ রাখে নি। অত্যন্ত দুঃখজনক ও উদ্বেগজনকভাবে, বর্তমান বিশ্বজুড়ে সম্প্রচারিত বেশিরভাগ অনুষ্ঠানের আধেয় কেবল সমাজের নৈতিক ও আধ্যাত্মিক বুননকে দুর্বল করার জন্য এবং যা কিছু উত্তম ও শালীন সেগুলো থেকে মানুষকে দূরে সরিয়ে নেওয়ার জন্য কাজ করে থাকে। স্বাধীনতা, চিত্ত-বিনোদন এবং আমোদ উপভোগের নামে তারা এধরনের অনৈতিক বিষয়গুলোর ন্যায্যতা প্রতিপাদন করে।

সুতরাং, যেখানে এই নতুন প্রযুক্তিগুলো আমাদের জন্য ইসলামের পবিত্র শিক্ষাগুলোকে পরিবেশন ও প্রচার করার মাধ্যম হিসেবে তৈরি করা হয়েছে, সেখানে এগুলো অন্যদের দ্বারা দুনিয়াকে অপকর্ম ও লজ্জাজনক অনৈতিক কাজে নিমজ্জিত করার জন্য ও ব্যবহৃত হচ্ছে। এগুলো মানবজাতিকে অযথা সময়-ক্ষেপণকারী কর্মকাণ্ডের প্রতি প্রলুব্ধ করার জন্য ব্যবহার করা হচ্ছে, যা কিনা প্রায়শই অশালীন। এটি এমন পর্যায়ে পৌঁছেছে যেখানে বিশ্বের সুবিধা-বঞ্চিত ও প্রত্যন্ত অঞ্চলের লোকেরা সামাজিক-যোগাযোগ-মাধ্যমের দ্বারা সহজেই উন্নত বিশ্বে তৈরিকৃত ভিডিও গুলো দেখতে পাচ্ছে, যেগুলো একটি সতীত্ব বর্জিত, অসংযমী ও আনন্দ-অভিলাষী জীবনধারাকে উৎসাহিত করে।এসব দারিদ্র্য-পীড়িত কিংবা তাদের জাতির পরিস্থিতির কারণে পিঁছিয়ে থাকা এধরনের জনগোষ্ঠী যখন দেখে যে, ধনী দেশগুলোর লোকেরা কীভাবে জীবনযাপন করছে, তখন এটি তাদের মাঝের হতাশাকে আরও উস্কে দেয়। তারা একই মানের সমৃদ্ধি ও প্রাচুর্য কামনা করে এবং এসব কৃত্রিম ও অগভীর লক্ষ্য অর্জন করতে চায়। যেমনটি আমি বলেছি, একদিকে আমরা বিশ্বাস করি যে, আধুনিক প্রযুক্তি আমাদেরকে ইসলামের প্রসারে সহায়তা করার জন্য আল্লাহর ইচ্ছানুসারে বিকশিত হয়েছে, আর অন্যদিকে এটি নৈতিকতা ও আধ্যাত্মিকতা বিবর্জিত গর্হিত বিষয় প্রচারে ব্যবহৃত হচ্ছে। উদাহরণস্বরূপ, পর্নোগ্রাফী বা অশ্লীল ছায়াছবিগুলো ব্যাপক পরিসরে এখন ইন্টারনেটে সহজলভ্য কিংবা টেলিভিশনে সম্প্রচারিত হয়। নর-নারীর মধ্যকার ব্যক্তিগত সম্পর্ক দুনিয়ার সামনে খোলামেলা, উন্মুক্ত এবং স্বাভাবিক হয়ে গেছে। এটি আধুনিক বিশ্বের বাস্তবতা এবং তাই এই নৈতিকতার পতন ঠেকানো এবং ন্যায়পরায়ণতা ও পুণ্যের প্রসার করাই আমাদের সময়ের বড় চ্যালেঞ্জ।লাজনা ইমাইল্লাহর সদস্যা হিসেবে আপনাদেরকে অবশ্যই এই চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করতে হবে।

প্রকৃতপক্ষে, প্রতিশ্রুত মসীহ্ (আ.) এর সম্প্রদায়ের সদস্য হিসেবে, প্রত্যেক আহমদী পুরুষ, নারী এবং আমাদের তরুণতরুণীদের কাজ হলো, ধর্মবিরোধী ও অনৈতিক শক্তিগুলোর প্রভাব মোকাবেলায় আধুনিক প্রযুক্তিগুলো ব্যবহার করা এবং এটি দেখানো যে, সমসাময়িক বিশ্বে ধর্মীয় মূল্যবোধগুলোকে তুলে

এরপর ৯ পাতায়.....

জুমআর খুতবা

যুদ্ধ পরিস্থিতি যেভাবে দ্রুতগতিতে তীব্র আকার ধারণ করছে আর ইসরাঈল সরকার এবং পরাশক্তিগুলোকে যে নীতি অবলম্বন করতে দেখা যাচ্ছে ফলতঃ এখন বিশ্বযুদ্ধ দুয়ারে অপেক্ষমান বলে মনে হচ্ছে আর বর্তমানে কতক মুসলিম রাষ্ট্রপ্রধানও এ কথা নির্দ্বিধায় বলা শুরু করেছে।

মহানবী (সা.)-এর যাওয়া এবং নিজের মেয়ে-জামাইকে এভাবে প্রেরণা প্রদান করা যেন তারা তাহাজ্জুদ-ও আদায় করে, এটি সেই শিক্ষার ওপর মহানবী (সা.)-এর পরিপূর্ণ বিশ্বাসের প্রমাণ বহন করে যে পথে তিনি লোকদের পরিচালিত করতে চাইতেন

মহানবী (সা.) সম্পদ বণ্টনের ক্ষেত্রে কতটা সতর্ক ছিলেন! যদিও জাঁতাকল চালাতে হযরত ফাতেমা (রা.)-এর হাতে কষ্ট হতো এবং তার একজন সেবকের প্রয়োজনও ছিল কিন্তু তিনি (সা.) তাকে সেবক দেন নি বরং তাদেরকে দোয়ার উপদেশ দেন এবং মহান আল্লাহর প্রতি মনোযোগ নিবদ্ধ করিয়েছেন।

মহানবী (সা.) প্রতিটি বিষয় বুঝানোর জন্য ধৈর্য অবলম্বন করতেন এবং ঝগড়ার পরিবর্তে স্নেহ ও ভালোবাসার সাথে কোনো ব্যক্তিকে তার ভুল ধরিয়ে দিতেন।

রাতের দোয়া -ই মূলত আল্লাহ্ তা'লার অনুগ্রহকে অধিক আকর্ষণ করে আর বর্তমানে তো পৃথিবীকে ধ্বংসের হাত থেকে বাঁচানোর জন্য এর বিশেষ প্রয়োজন রয়েছে।

আঁ হযরত (সা.) বনু কায়েনকা গোত্রকে বোঝানের চেষ্টা করেন,কিন্তু তারা বোঝার পরিবর্তে প্রকাশ্য হুমকি দিতে শুরু করে।

আঁ হযরত (সা.) একজন রাষ্ট্রের অধিপতি হওয়া সত্ত্বেও শত্রুর সাথে কখনো অযথা কঠোর আচরণ করেন নি। তিনি (সা.) কঠোরতা অপছন্দ করতেন। তিনি (সা.) বাধ্য হয়েই যুদ্ধ ক্ষেত্রে যেতেন এবং সেখানেও অপ্রয়োজনীয় রক্তপাত এড়িয়ে চলতেন।

ইহুদীদের সাথে সম্পাদিত চুক্তির পর আঁ হযরত (সা.) বিশেষভাবে ইহুদীদের মনঃতুষ্টির বিষয়ে যত্নবান থাকতেন।

কাজেই আহমদীদেরকে দোয়ার প্রতি দৃষ্টি দেওয়া উচিত। নিশ্চিন্ত হবেন না। এ পরিস্থিতিকে সামনে রেখে প্রতি নামাযে নূন্যতম একটি সিজদা অথবা দিনে ন্যূনতম কোন এক ওয়াক্ত নামাযে একটি সিজদায় দোয়া করা আবশ্যক।

সার্বিক পরিস্থিতিকে সকলের সামনে রাখাই তো ন্যায়পরায়ণতা। এরপর বিশ্ববাসীকে সিদ্ধান্ত নিতে দিন যে, কে অত্যাচারী এবং কে অত্যাচারিত আর কোন্ সীমা পর্যন্ত এ যুদ্ধ বৈধ আর কোন্ পর্যায়ে এ যুদ্ধ শেষ হওয়া উচিত?

মহানবী (সা.) এর প্রতি ভালবাসার দাবি হলো, আমরা যেন মুসলমানদের জন্য অধিক পরিমাণে দোয়া করি। আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকে এর তৌফিক দিন এবং মুসলমানদেরও এবং বিশ্ববাসীকে বিবেক দিন।

সৈয়্যদনা আমিরুল মো'মিনিন খলিফাতুল মসীহ্ আল খামিস (আইঃ) কর্তৃক লন্ডনের টিলফোর্ড স্থিত মসজিদে মুবারকে প্রদত্ত ২৭ অক্টোবর, , ২০২৩, এর জুমুআর খুতবা (২৭ ইখা ১৪০২ হিজরী শামসী)

সৌজন্যে: আল-ফযল ইন্টারন্যাশনাল লন্ডন

أَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ

أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ - بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ -

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ - الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ - مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ - اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَاِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ -

اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ - صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ ۙ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ -

তাশাহ্হুদ, তা'উয এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন, মহানবী (সা.)-এর সীরাত তথা জীবনীর উল্লেখ চলছিল। বিভিন্ন রেওয়ায়েতে মহানবী (সা.)-এর স্বীয় কন্যা ও জামাতাকে তাহাজ্জুদ নামাযের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করার ঘটনার উল্লেখ বুখারীতে এভাবে করা হয়েছে যে, হযরত আলী বিন আবু তালেব বর্ণনা করেন, মহানবী (সা.) এক রাতে তার এবং নিজ কন্যা হযরত ফাতেমার কাছে আগমন করেন এবং বলেন, তোমরা উভয়ে কী নামায পড়ো না? তখন আমি নিবেদন করি, হে আল্লাহ্র রসূল (সা.)! আমাদের প্রাণ আল্লাহ্ তা'লার হাতে। তিনি যখন আমাদের জাগাতে চান তখন জাগিয়ে দেন, এখানে তাহাজ্জুদ নামাযের কথা হচ্ছে। হযরত আলী বলেন যে, মহানবী (সা.) আমাদেরকে এর কোনো উত্তর দেননি এবং ফিরে যান। এরপর তিনি (সা.) যখন ফিরে যাচ্ছিলেন তখন আমি তাঁকে (সা.) বলতে শুনি যে, তিনি (সা.) নিজ উরু চাপড়ে বলছিলেন, وَكَانَ الْاِنْسَانُ اَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا ((সূরা কাহাফ: ৫৫) অর্থাৎ, মানুষ সবচেয়ে বেশি তর্ক করে।

(সহীহ বুখারী, কিতাবুত তাহাজ্জুদ, হাদীস-১১২৭)

হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) এই ঘটনার বিস্তারিত এভাবে বর্ণনা করেছেন যে, একবার তিনি (সা.) রাতে তাঁর জামাতা হযরত আলী এবং নিজ কন্যা হযরত ফাতেমার ঘরে যান এবং বলেন, তোমরা কি তাহাজ্জুদ পড়ো? অর্থাৎ সেই নামায যা মধ্যরাতের নিকটবর্তী সময়ে উঠে পড়া হয়। হযরত আলী (রা.) নিবেদন করেন যে, হে আল্লাহ্র রসূল (সা.)! পড়ার চেষ্টা তো করি, কিন্তু যখন খোদা তা'লার ইচ্ছানুযায়ী কখনো আমাদের চোখ বন্ধ থাকে তখন তাহাজ্জুদ পড়া হয় না। তিনি (সা.) বলেন, তাহাজ্জুদ পড়ো! এবং উঠে নিজ ঘরের দিকে যাত্রা করেন আর পথে বার বার বলছিলেন, وَكَانَ الْاِنْسَانُ اَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا এটি পবিত্র কুরআনের একটি আয়াত যার অর্থ হলো, মানুষ অধিকাংশ সময় নিজ দোষ স্বীকার করতে ভয় পায় আর বিভিন্ন প্রকার যুক্তি দিয়ে নিজ দোষ ঢাকার চেষ্টা করে। বলার অর্থ হলো, হযরত আলী এবং হযরত ফাতেমা একথা বলার পরিবর্তে যে, আমাদের কখনো কখনো ভুলও হয়ে যায়, তারা এটি কেনো বললেন যে, যখন খোদার ইচ্ছা হয় যে, আমরা যেন না জাগি তখন আমরা ঘুমিয়ে থাকি আর নিজেদের ভুলকে আল্লাহ্ তা'লার প্রতি কেনো আরোপ করলেন।"

(দিবচা তফসীরুল কুরআন, আনোয়ারুল উলুম, খণ্ড-২০, পৃ: ৩৮৯-৩৯০)

এই বিষয়টি আরো বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করতে গিয়ে এক স্থানে হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বলেন, হযরত আলী নিজের একটি ঘটনা বর্ণনা করেন যা দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, এক উপলক্ষ্যে যখন হযরত আলী তাঁকে (সা.) এমন উত্তর দেন যাতে তর্ক এবং প্রতিদ্বন্দ্বিতার ধরন পাওয়া যায় তখন মহানবী (সা.) অসন্তুষ্ট হওয়া বা বিরক্তি প্রকাশের পরিবর্তে এমন একটি সূক্ষ্ম পন্থা অবলম্বন করেন যে, হযরত আলী সম্ভবত নিজ জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত এর মিষ্টতা থেকে স্বাদ গ্রহণ করে থাকবেন। আর তিনি যে আনন্দ লাভ করে থাকবেন তা তো তারই অধিকার ছিল, এখনও মহানবী (সা.)-এর এই অসন্তুষ্টি প্রকাশের কথা জেনে প্রত্যেক সূক্ষ্মদর্শী দৃষ্টি হতভম্ব হয়ে যায়। হযরত আলী (আল্লাহ্ তার প্রতি কৃপা করুন) বলেন, মহানবী (সা.) একরাতে আমার এবং ফাতেমাতুয্ যাহরা-র কাছে আগমন করেন, যিনি মহানবী (সা.)-এর কন্যা ছিলেন, এবং বলেন, তোমরা কি তাহাজ্জুদের নামায পড়ো না? আমি উত্তরে বলি যে, হে

আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)! আমাদের প্রাণ তো আল্লাহ্ তা'লার করায়ত্বে , তিনি যখন চান জাগিয়ে দেন। তিনি (সা.) এই উত্তর শুনে ফিরে যান এবং আমাকে কিছুই বলেননি। এরপর আমি তাঁকে বলতে শুনি, আর তখন তিনি পিঠ ফিরিয়ে উঠে দাঁড়িয়েছিলেন এবং তিনি তার উরু চাপড়ে বলছিলেন যে, মানুষ তো অধিকাংশ ক্ষেত্রে তর্ক করতে আরম্ভ করে।

সুবহানাল্লাহ্! কতই না সূক্ষ্মভাবে তিনি (সা.) হযরত আলীকে বুঝিয়েছেন যে, উনার এই উত্তর দেওয়া উচিত হয়নি। অন্য কেউ হলে শুরুতেই এই তর্ক আরম্ভ করে দিত যে, আমার পদ এবং মর্যাদার প্রতি লক্ষ্য করো আর এরপর নিজের উত্তরের প্রতি লক্ষ্য করে দেখো! তোমার জন্য কি এটি সমীচীন ছিল যে, তুমি এভাবে আমার কথাকে প্রত্যাখ্যান করলে? এটি না হলেও কমপক্ষে এই তর্ক আরম্ভ করত যে, তোমার এই দাবি ভুল যে, মানুষ অপারগ আর তার সমস্ত কাজ আল্লাহ্ তা'লার হাতে। তিনি যেভাবে চান আমল করান , চাইলে নামাযের তৌফিক দেন, চাইলে দেন না। আর বলত যে, জোর করার বিষয়টি পবিত্র কুরআনের বিরোধী। এই সবকিছুই মহানবী (সা.) বলতে পারতেন। কিন্তু তিনি (সা.) এই উভয় পদ্ধতি থেকে কোনো একটিও অবলম্বন করেননি এবং তাদের প্রতি অসন্তুষ্টও হননি। আর তর্ক করে হযরত আলীকে তার কথার ভ্রান্তি সম্পর্কে অবগত করেননি, বরং এক পাশে গিয়ে তার এই উত্তরে এভাবে বিমূঢ়তা প্রকাশ করেন যে, মানুষও অদ্ভুত, প্রতিটি বিষয়েই নিজ স্বার্থের কোনো না কোনো দিক বের করেই নেয় আর তর্ক করা আরম্ভ করে। প্রকৃত অর্থে মহানবী (সা.)-এর এতটুকু বলে দেওয়া এমন এমন কল্যাণকর দিক নিজের মাঝে রাখতো যার শতভাগের একভাগও অন্য কারো শত তর্কেও লাভ হতে পারে না। এই হাদীস দ্বারা আমরা বহু বিষয় জানতে পারি। এরপর তিনি এর বিশ্লেষণ করেন যে, কোন কোন বিষয় জানা যায়, যেগুলোর মাধ্যমে মহানবী (সা.)-এর চরিত্রের বিভিন্ন দিকের প্রতি আলোকপাত হয়। আর এখানেই সেগুলোর উল্লেখ করা সমীচীন হবে। প্রথমত এটি জানা যায় যে, তাঁর (সা.) ধার্মিকতার প্রতি কতটা দৃষ্টি ছিল যে, রাতের বেলা ঘুরে ঘুরে নিজ নিকটাত্মীয়দের খেয়াল করতেন।

অনেকেই থাকে যারা যদিও নিজেরা পুণ্যবান হয় আর মানুষকেও পুণ্যের শিক্ষা দেয়, কিন্তু তাদের ঘরের অবস্থা শোচনীয় হয়ে থাকে। আর তাদের মাঝে এই উপাদান থাকে না যে, নিজ ঘরের লোকদেরও সংশোধন করবে। আর এমন লোকদের সম্পর্কেই এই প্রবাদ রয়েছে যে, বাতির নীচে অন্ধকার। অর্থাৎ যেভাবে প্রদীপ নিজের আশেপাশের সমস্ত জিনিসকে আলোকিত করে কিন্তু তার নিজের নীচেই অন্ধকার থাকে অনুরূপভাবে এরা অন্যদের তো নসীহত করতে থাকে কিন্তু নিজ ঘরের চিন্তা করে না যে, আমাদের আলোয় আমাদের নিজেদের ঘরের লোকেরা কী কল্যাণ লাভ করছে। কিন্তু মহানবী (সা.)-এর এই বিষয়ের প্রতি খেয়াল প্রতিভাত হয় যে, তাঁর কাছের লোকেরাও যেন সেই জ্যোতিতে জ্যোতির্মণ্ডিত হয় যার দ্বারা তিনি জগৎকে আলোকিত করতে চাইতেন। আর এর অঙ্গীকারও তিনি করতেন এবং তাদের পরীক্ষা করা ও শিক্ষিত করায় রত থাকতেন। আর আত্মীয় স্বজনের তরবিয়ত এমন এক উন্নত মানের গুণ যা তাঁর (সা.) মাঝে যদি না থাকতো তাহলে তাঁর চরিত্রে একটি মূল্যবান জিনিসের ঘাটতি থেকে যেতো। কিন্তু তিনি যেহেতু উন্নত চরিত্রে অধিষ্ঠিত ছিলেন তাই এই গুণ তাঁর মাঝে পূর্ণরূপে ছিল।

দ্বিতীয় বিষয় এটি জানা যায় যে, তাঁর (সা.) সেই শিক্ষার ওপর পূর্ণ বিশ্বাস ছিল যা তিনি জগদ্বাসীর সামনে উপস্থাপন করতেন। আর এক মুহূর্তের জন্যও তিনি এর প্রতি সন্দেহ করতেন না। আর যেমনটি মানুষ আপত্তি করে যে, নাউযুবিল্লাহ্ জগদ্বাসীকে বোকা বানানোর জন্য এবং নিজ কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত করার জন্য তিনি (সা.) এসব কর্মকাণ্ড সাজিয়েছিলেন নতুবা তাঁর প্রতি কোনো ওহী অবতীর্ণ হতো না- ইসলাম বিরোধীরা এই আপত্তিই করে। বহু প্রাচ্যবিশারদ এভাবে লিখে থাকে আর তৎকালীন কাফেররাও একথাই বলতো। প্রকৃত বিষয় এমন নয়, বরং তাঁর (সা.) নিজের রসূল ও খোদা তা'লা কর্তৃক প্রেরিত হওয়ার বিষয়ে এমন আত্মবিশ্বাস ছিল, এমন দৃঢ় প্রত্যয় ছিল যার কোনো দৃষ্টান্ত পৃথিবীতে খুঁজে পাওয়া যায় না। কেননা মহানবী (সা.)-এর পক্ষে পৃথিবীতে মিথ্যার আশ্রয় নিয়ে স্বীয় সত্যতা মানুষের মাঝে প্রমাণ করাটা সম্ভব হলেও এটি ধারণাও করা যেতে পারে না যে, এক ব্যক্তি রাতে বিশেষকরে নিজের মেয়ে-জামাইয়ের কাছে যাবে এবং তাদের জিজ্ঞাসা করবে, তারা কি সেই ইবাদত-ও করে যা তিনি আবশ্যিক করেন নি বরং এগুলো পালন করাকে মু'মিনদের স্বীয় অবস্থার ওপর ছেড়ে দিয়েছেন আর যা কি-না মধ্যরাতে উঠে আদায় করতে হয়। সেসময় মহানবী (সা.)-এর যাওয়া এবং নিজের মেয়ে-জামাইকে এভাবে প্রেরণা প্রদান করা যেন তারা তাহাজ্জুদ-ও আদায় করে, এটি সেই শিক্ষার ওপর মহানবী (সা.)-এর পরিপূর্ণ বিশ্বাসের প্রমাণ বহন করে যে পথে তিনি লোকদের পরিচালিত করতে চাইতেন, অন্যথায় একজন মিথ্যাবাদী মানুষ যে জানে, একটি শিক্ষার ওপর চলা একই কথা- সে এমন গোপন সময়ে এ শিক্ষার ওপর আমল করার নসীহত করতে পারে না। চলা বা না চলা একই কথা। নিজ সন্তানদের স্বীয় শিক্ষার ওপর চলার নসীহত করতে পারেন না। এটি তখনই সম্ভব যখন এক ব্যক্তি মন থেকে বিশ্বাস করবে যে, এই শিক্ষার ওপর চলা ব্যতীত পরিপূর্ণতা লাভ হতে পারে না।

তৃতীয় বিষয় সেটিই যা প্রমাণ করার জন্য এই ঘটনা বর্ণনা করা হয়েছে অর্থাৎ মহানবী (সা.) প্রতিটি বিষয় বুঝানোর জন্য ধৈর্য অবলম্বন করতেন এবং ঝগড়ার পরিবর্তে স্নেহ ও ভালোবাসার সাথে কোনো ব্যক্তিকে তার ভুল ধরিয়ে দিতেন। সুতরাং এ স্থলে হযরত আলী (রা.) যখন তাঁর প্রশ্নকে এভাবে খণ্ডন করতে চাইলেন যে, আমরা যখন ঘুমিয়ে যাই তখন আমাদের হাতে আর কী নিয়ন্ত্রণ থাকে, কেননা ঘুমন্ত ব্যক্তি নিজের ওপর নিয়ন্ত্রণ রাখে না। সে যখন ঘুমিয়ে যায় তখন কী আর বলতে পারে যে, অমুক সময় এসে গেছে, আমাকে অমুক কাজ করতে হবে। আল্লাহ্ তা'লা চোখ খুলে দিলে নামায আদায় করি অন্যথায় বাধ্য থাকি, কেননা সে সময় এ্যালার্ম ঘড়ি ইত্যাদি ছিল না। একথা শুনে মহানবী (সা.)-এর আশ্চর্য হবার কথাই ছিল, কেননা তাঁর (সা.) হৃদয়ে যে ঈমান ছিল তা তাঁকে কখনো এমন অলস হতে দিত না যে, তাহাজ্জুদের সময় অতিবাহিত হয় আর তিনি (সা.) টেরই পেতেন না। একারণে তিনি (সা.) অন্যদিকে মুখ ঘুরিয়ে কেবল এটি বলেন, মানুষ দোষ স্বীকার করে না, কেবল অজুহাত দেখাতে থাকে। অর্থাৎ তোমার ভবিষ্যতের জন্য চেষ্টা করা উচিত ছিল যাতে সময় নষ্ট না হয়। এমনভাবে উত্তর দেওয়া উচিত হয় নি। অতএব হযরত আলী (রা.) বলেন, আমি এরপর কখনো তাহাজ্জুদ নামাযে অলসতা করি নি।

[সীরাতুন নবী (সা.), আনোয়ারুল উলুম, ১ম খণ্ড, পৃ: ৫৮৮-৫৯০]

সুতরাং এই ঘটনাটি তাহাজ্জুদ নামাযে মনোযোগ নিবদ্ধ করার জন্য আমাদের স্মরণ রাখা উচিত। আর বিশেষকরে মুরব্বীদের, ওয়াকেফে যিন্দেগীদের এবং কর্মকর্তাদের এদিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করা উচিত। রাতের দোয়া -ই মূলত আল্লাহ্ তা'লার অনুগ্রহকে অধিক আকর্ষণ করে আর বর্তমানে তো পৃথিবীকে ধ্বংসের হাত থেকে বাঁচানোর জন্য এর বিশেষ প্রয়োজন রয়েছে।

অতঃপর বনূ কাইনুকার যুদ্ধের উল্লেখ রয়েছে যা দ্বিতীয় হিজরীতে সংঘটিত হয়েছে। এ ব্যাপারে লেখা আছে, মহানবী (সা.)-এর মদীনা হিজরত করার পর আরবের কাফিরদের অবস্থা আর একরকম থাকল না। তারা তিন ভাগে বিভক্ত হয়েছিল। একদল ছিল যাদের সাথে তিনি (সা.) এ শর্তে সন্ধি করেছিলেন যে, তারা তাঁর (সা.) সাথে যুদ্ধও করবে না এবং তাঁর (সা.) শত্রুদেরও সাহায্য করবে না। এ অঙ্গীকারকারী ইহুদীদের তিনটি গোত্র ছিল বনূ কুরাইযা, বনূ নাযীর এবং বনূ কাইনুকা। দ্বিতীয় দল তারাই ছিল যারা মহানবী (সা.)-এর সাথে শত্রুতা করেছিল এবং তাঁর (সা.) বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছিল। তারা ছিল কুরাইশ। তৃতীয় দল ছিল যারা মহানবী (সা.)-কে ছেড়ে দিয়েছিল এবং তাঁর (সা.) পরিণতির অপেক্ষা করছিল, যেমন- আরবের অন্যান্য গোত্রসমূহ। তাদের অবস্থাও একরকম ছিল না। তাদের মাঝে কতক এমন ছিল যারা হৃদয়ের অন্তস্তল থেকে চাইত যে, মুসলমানরা বিজয় লাভ করুক, যেমন- বনূ খুযাআ গোত্র। কিছু মানুষের অবস্থা ছিল ঠিক এর বিপরীত, যেমন- বনূ বকর গোত্রের মানুষ। কিছু মানুষ এমনও ছিল যারা বাহ্যত মুসলমানদের পক্ষে থাকলেও ভিতরে ভিতরে মহানবী (সা.)-এর শত্রুদের সাহায্য করত। এরা মুনাফিক ছিল। মহানবী (সা.) যখন মদীনা আসেন তখন তিনি (সা.) সকল ইহুদীদের সাথে চুক্তি করেন। মহানবী (সা.) এবং তাদের মধ্যকার চুক্তি সাক্ষরিত হয়। সকল গোত্র তাদের মিত্রদের সাথে একতাবদ্ধ হয়। এ পর্যায়ে তিনি (সা.) তাঁর ও তাদের মধ্যকার শান্তিচুক্তি লিখেন। তাদের ওপর অনেক শর্ত আরোপ করেন। এর মাঝে একটি শর্ত হলো, তারা মহানবী (সা.)-এর বিরুদ্ধে কোনো শত্রুদের সাহায্য করতে পারবে না। এটি ছিল চুক্তি। এরপর বনূ কাইনুকা গোত্র যারা নৈরাজ্য সৃষ্টিকারী ছিল তাদের সম্পর্কে ইতিহাসগ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে, ইবনে ইসহাক বলেন, শা'স বিন কায়েস নামে এক বৃদ্ধ যার হৃদয় মুসলমানদের বিরুদ্ধে হিংসা বিদ্বেষে পূর্ণ ছিল। একদা অওস ও খাযরাজ গোত্রের কিছু সাহাবী এক সভায় একত্রে বসে আলোচনা করছিলেন। শা'স বিন কায়েস সে পথ দিয়ে যাচ্ছিল। সে যখন তাদেরকে অজ্ঞতার যুগের শত্রুতা ভুলে ইসলামের কারণে পরস্পরের প্রতি ভালোবাসা এবং শান্তি - সৌহার্দ্যের সাথে একত্রে বসে থাকতে দেখল তখন সে জ্বলেপুড়ে মরছিল। সে তৎক্ষণাৎ বনূ কিলা-র প্রধানদের বলল, (অর্থাৎ অওস ও খাযরাজ গোত্রের প্রধান যারা সে শর্তে ঐক্যবদ্ধ হয়েছিল) আল্লাহ্‌র কসম! তাদের সম্মানিত মানুষরা যেহেতু ঐক্যবদ্ধ হয়ে গেছে তাই এখানে আমাদের জন্য তাদের

সাথে থাকার কোনো জায়গা নেই। উত্তেজিত করার চেষ্টা করছিল। তার সাথে একজন ইহুদী যুবক ছিল। সে তাকে এই নির্দেশ দিল যে, তুমি তাদের কাছে যাও এবং তাদের সাথে বসো। এরপর তাদের সামনে বু য়াসের যুদ্ধের এবং এর পূর্বের ঘটনার অবতারণা করবে আর সে সম্পর্কে তারা নিজেদের মাঝে যে পংক্তি পাঠ করত সেগুলোর মধ্য থেকে কিছু পংক্তি শুনাবে। অজ্ঞতার যুগে অওস ও খাযরাজ গোত্রের মাঝে বুয়াসের যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল যেখানে অওস গোত্র খাযরাজের বিপক্ষে জয় লাভ করেছিল। সে সময় অওস গোত্রের প্রধান ছিল হুযায়ের বিন সামাক আশআলী। সে হযরত উসায়েদ (রা.) -এর পিতা ছিল। খাযরাজ গোত্রের প্রধান ছিল আমর বিন নুমান বিয়াজি। এ দুজন সেই যুদ্ধে নিহত হয়েছিল। সেই ইহুদী যুবক মুসলমানদের মাঝে বসে সে ঘটনারই অবতারণা করে এবং উত্তেজনা সৃষ্টি করে। অওস ও খাযরাজ গোত্রের সুপ্ত পুরোনো আবেগ জাগ্রত হয় এবং তারা উত্তেজিত হয়ে যায়। তাদের মাঝে তুইতোকারি শুরু হয়ে যায়। তারা নিজেদের মাঝে বিতর্ক এবং একে অপরের ওপর গৌরব প্রদর্শন করা শুরু করে। তর্ক এতদূর গড়ায় যে, দুই গোত্রের প্রত্যেকে সামনাসামনি হাঁটু গেড়ে বসে যায় এবং পরস্পর কথা কাটাকাটি করতে থাকে। তর্ক বৃদ্ধি পেতে থাকে। অওস-এর পক্ষ থেকে অওস বিন কাযি ছিল এবং খাযরাজ-এর পক্ষে জাব্বার বিন সাখার ছিল। বিতর্ক চলাকালে তাদের একজন অন্যজনকে বলে, তুমি যদি চাও তাহলে আমরা সেই যুদ্ধকে পুনরায় জীবন্ত করতে পারি। অতঃপর দুই গোত্রই ক্ষেপে যায় এবং বলে, আমরা প্রস্তুত। তোমরা একদিকে মুসলমান হয়েছ আর অন্যদিকে এই অজ্ঞতাও একই সাথে চলছে। এরপর তারা বলে, তোমাদের জন্য নির্ধারিত স্থান হলো হাররা। মদীনা দুটি হাররা-এর মধ্যে অবস্থিত একটি হাররা। কালো পাথর সমৃদ্ধ মাটির এলাকাকে হাররা বলে। পূর্ব দিকে হাররায়ে আকিম অবস্থিত। যাকে হাররায়ে বনু কুরাইযাও বলা হয়। অন্যটি হলো হাররাতুল ওবরা যা পশ্চিম দিকে অবস্থিত। একটি পূর্ব দিকে, একটি পশ্চিম দিকে অবস্থিত। এই তিনটির মাঝে তিন মাইলের দূরত্ব। সঙ্গে সঙ্গে 'হাতিয়ার হাতিয়ার' বলে হইচই আরম্ভ হয়ে যায়। এরপর পরিবেশ চরম উত্তপ্ত হয়ে যায় এবং উভয় পক্ষ থেকে উদ্যমের সাথে যুদ্ধের প্রস্তুতি শুরু হয়। দুই গোত্রের মানুষ নির্ধারিত সময়ে হাররার দিকে যাওয়া শুরু করে। রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের সম্ভাবনা ছিল কিন্তু আল্লাহ্‌র পরিকল্পনা অনুযায়ী মহানবী (সা.) উদ্ভূত পরিস্থিতি সম্পর্কে জেনে যান। সংবাদ পেয়েই তিনি (সা.) মুহাজের সাহাবীদের নিয়ে অওস ও খাযরাজ গোত্রের নিকট যান। তিনি (সা.) অত্যন্ত প্রজ্ঞার সাথে বলেন, আল্লাহ! আল্লাহ! আমার উপস্থিতিতে পুনরায় জাহেলিয়্যাতের (অজ্ঞতার) যুগের অবতারনা আর তা -ও আবার আল্লাহ্ তা'লার পক্ষ থেকে তোমাদের হিদায়াত লাভের পর? তিনি এর (অর্থাৎ ইসলামের) মাধ্যমে তোমাদের মর্যাদা প্রদান করেছেন। তোমাদের মধ্য হতে অজ্ঞতার যুগের চিহ্নাবলী মিটিয়ে দিয়েছেন। তোমাদেরকে কুফর হতে মুক্তি প্রদান করেছেন এবং তোমাদের অন্তরে ভালোবাসা সৃষ্টি করেছেন।

এসব সত্ত্বেও তোমরা এসব কিছু করছ? মহানবী (সা.)-এর একথা তাদের অন্তরে অত্যন্ত প্রভাব সৃষ্টি করে। এর ফলে তারা অনুশোচনা করতে লাগে এবং কাঁদতে শুরু করে। অওস ও খাযরাজ গোত্রের লোকেরা যারা একে অপরের সাথে মারামারি করার উদ্দেশ্যে একত্রিত হয়েছিল তারা কোলাকুলি করে এবং " শুনলাম ও আনুগত্য করলাম"-এর দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করে মহানবী (সা.)-এর সাথে ফিরে আসে। এটি সীরাতে ইবনে হিশামের বর্ণনা।

(সীরাত ইবনে হিশাম, পৃ: ৩৮৫-৩৮৬) (ফারহাঙ্গো সীরাত, পৃ: ১০১-১০২)

ইহুদীদের পক্ষ থেকে চুক্তিভঙ্গের বিষয়ে লিখেছেন, বদরের যুদ্ধে আল্লাহ্ তা'লা যখন মুসলমানদেরকে অসাধারণ বিজয় দান করেন তখন তাদের ঔদ্ধত্য সুস্পষ্টরূপে প্রকাশ পেয়ে যায়। মহানবী (সা.) ও সাহাবীদের প্রতি তাদের বিদ্বেষ প্রকাশিত হয়ে পড়ে। তাদের এ বৈরিতা ও হিংসার কারণে তারা চুক্তি ভেঙে ফেলে। তারা বলতে শুরু করে, হে মুহাম্মদ (সা.)! আপনি মনে করছেন, আমরা আপনার জাতির মতো। আপনি এ ভুলের মধ্যে থেকেন না। আপনি একটি অপারদর্শী ও অজ্ঞ জাতির বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে বিজয় লাভ করেছেন। অর্থাৎ বদরের যুদ্ধের দিকে ইঙ্গিত করে বলে, মক্কার কাফিরদের তো আপনি পরাজিত করেছেন তবে আমরা তাদের মতো নই। আমরা বীর। আল্লাহ্‌র কসম! আমরা আপনাদের সাথে যুদ্ধ করলে আপনি জানতে পারবেন আমরা হলাম পুরুষ। ইহুদীদের তিন গোত্রের মধ্য হতে বনু কাইনুকা গোত্রের ইহুদীরা সর্বপ্রথম চুক্তি ভঙ্গ করে।

তাদের ঔদ্ধত্য ও প্ররোচনার বিষয়ে এ-ও বর্ণিত হয়েছে যে, তাদের প্ররোচনার ঘটনাটি একজন মুসলমান মহিলার সাথে সংঘটিত হয়েছে। বর্ণিত হয়েছে, মহানবী (সা.)-এর প্রতি তাদের বিদ্বেষ প্রকাশিত হবার সাথে সাথে এ ঘটনাটি সংঘটিত হয়। একজন আনসারী মহিলা তার ব্যবসায়ী সামগ্রী-সহ যার মধ্যে উট ও ছাগল ছিল বনু কাইনুকার বাজারে যায় যাতে করে এগুলো বিক্রি করে সে মুনাফা অর্জন করতে পারে। এসব সামগ্রী সে বনু কাইনুকার বাজারে বিক্রি করে। এরপর সে ইহুদী এক স্বর্ণকারের দোকানে অলংকার কেনার জন্য বসে। সে তার দেহ ও চেহারা ঢেকে রেখেছিল। কিছু দুষ্ট ইহুদী, সে মহিলাকে চেহারা দেখানোর জন্য বলতে লাগে কিন্তু সেই মহিলা অস্বীকার করে। সেই দোকানদার তার আসন থেকে উঠে, চুপিসারে সেই মহিলার নেকাবের (চেহারা ঢাকার কাপড়) এক কোণা, কোনো কিছুর সাথে বেঁধে দেয়। আরেকটি বর্ণনায় এসেছে, সে চুপিসারে তার চাদরের এক কোণা, কোনো কাঁটা অথবা পেরেকের সাথে আটকে দেয়। মহিলা এসব কিছু জানতে পারে নি। সেই মহিলা যখন যাওয়ার জন্য উঠে দাঁড়ালো, তখন আটকে থাকার কারণে কাপড়টি খুলে যায় এবং সে বিবস্ত্র হয়ে পড়ে। ইহুদীরা হাসিঠাট্টা করতে শুরু করে। এ অপকর্মে সেই মহিলা চিৎকার আরম্ভ করে। একজন মুসলমান পুরুষ যখন ইহুদীদের এই দুষ্টামি দেখে তখন সে সেই ইহুদী স্বর্ণকারের দিকে দৌড় দেয় এবং তরবারি দিয়ে তাকে হত্যা করে। এ ঘটনা দেখে ইহুদীরা সেই মুসলমানের উপর হামলা করে এবং তাকে হত্যা করে। এ ঘটনার পর মুসলমানদের মাঝে বনু কাডনুকার ইহুদীদের বিরুদ্ধে ভীষণ ক্ষোভের সৃষ্টি হয়। তিনি (সা.) ইহুদী গোত্রসমূহকে বললেন, তোমাদের সাথে এসব কর্মকাণ্ডের জন্য সন্ধিচুক্তি করা হয় নি। হযরত উবাদা বিন সামেত (রা.) বলেন, হে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)! আমি আল্লাহ্ ও তাঁর রসূল এবং মুসলমানদের সাথী আর ঐ কাফেরদের চুক্তিনামা থেকে দায়মুক্তির ঘোষণা দিচ্ছি।

(আসসীরাতুল হালবিয়া, ২য় খণ্ড, পৃ: ২৮৪) (সীরাত ইবনে হিশাম, পৃ: ৫১৪)

যাহোক, মহানবী (সা.) বনু কায়নুকাকে খুব বুঝানোর চেষ্টা করেন কিন্তু তারা কোঝার বদলে প্রকাশ্যে হুমকি-ধমকি দেওয়া শুরু করে।

এর বিস্তারিত এভাবে লিখেছেন:বনু কায়নুকাকে একত্রিত করে মহানবী (সা.) বলেন, হে ইহুদীর দল! আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে আগত এমন আযাব থেকে বাঁচার চেষ্টা করো যেভাবে বদরে কুরায়েশদের ওপর আযাব অবতীর্ণ হয়েছিল। তাই অনুসারী ও অনুগামী হয়ে যাও কেননা তোমাদের জানা আছে যে, আমি আল্লাহ্ তা'লার পক্ষ থেকে প্রেরিত এক রসূল আর এর সত্যতা তোমরা তোমাদের কিতাবে উল্লেখ দেখতে পাও এবং সেই অঙ্গীকারকেও স্মরণ করো আল্লাহ্ তোমাদের কাছ থেকে যে অঙ্গীকার গ্রহণ করেছিলেন। তারা বলল, হে মুহাম্মদ! আপনি হয়তো ভাবছেন আমরাও আপনার জাতির ন্যায়- এমন অলীক ধারণায় পড়ে থাকবেন না কেননা আপনারা এখন পর্যন্ত এমন জাতির সাথে মুখোমুখি হয়েছেন যারা যুদ্ধ এবং যুদ্ধের কৌশল সম্বন্ধে অনবহিত তাই আপনারা তাদেরকে অতি সহজে পরাস্ত করতে পেরেছেন কিন্তু খোদার কসম! আপনারা যদি আমাদের সাথে যুদ্ধ করেন তাহলে আপনারা জানতে পারবেন যে, আপনারা কেমন বীরপুরুষের মুখোমুখি হয়েছেন। অপর এক বর্ণনায় দেখা যায়, মহানবী (সা.) বদরের যুদ্ধের সময় যখন ইহুদীদের চুক্তিভঙ্গের খবর পেলেন তখন তিনি (সা.) ইহুদীদের বনু কায়নুকার বাজারে সমবেত করে এই সাবধান বাণী উচ্চারণ করেন।

যাহোক, তিনি (সা.) তাদেরকে সাবধান করেছিলেন যার বিপরীতে তাদের প্রত্যুত্তর এমনই ছিল। এরপর বনু কায়নুকার ইহুদীরা সেখান থেকে গিয়ে দুর্গের ভিতর আশ্রয় নেয়। এই সমস্ত কথা শেষ হবার পর তারা চলে যায় এবং নিজেদের দুর্গে প্রবেশ করে। মহানবী (সা.) যখন তাদের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন এবং তিনি (সা.) হযরত আবু লুবাবা (রা.)-কে মদীনায় নিজ স্থলাভিষিক্ত নিযুক্ত করেন। মহানবী (সা.)-এর পতাকার রং ছিল সাদা এবং সেটি তাঁর চাচা হযরত হামযা (রা.) বহন করছিলেন। বনু কায়নুকা অবরোধ করা হয়। এর বিস্তারিত এভাবে লেখা হয়েছে, মহানবী (সা.) ১৫ দিন পর্যন্ত বনু কায়নুকার ইহুদীদেরকে কঠিন অবরোধ করে রাখেন আর মহানবী (সা.) এই যুদ্ধের জন্য শাওয়ালের ১৫ তাং যাত্রা করেন এবং যুল কা'দার চাঁদ পর্যন্ত সেখানেই অবস্থান করেন।

(আসসীরাতুল হালবিয়া, ২য় খণ্ড, পৃ: ২৮৫) (সুবুলুল হুদা ওয়ার রিশাদ, ৪র্থ খণ্ড, পৃ: ১৭৯)

আল্লাহ্ তা'লা তাদের হৃদয়ে মুসলমানদের ভীতি সৃষ্টি করে দেন। বনু কায়নুকার ঐ ইহুদীদের মাঝে চার'শ যুদ্ধবাজ ছিল যারা দুর্গের সুরক্ষার

মসীহ মওউদ (আ.)-এর বাণী

দোয়ার জন্য হৃদয় যখন বেদনায় পূর্ণ হয়ে যায় এবং সকল আবরণকে বিদীর্ণ করে ফেলে, সেই সময় বুঝে যাওয়া উচিত যে দোয়া কবুল হয়েছে। এটি মহান নাম। **(মালফুযাত, ৩য় খণ্ড, পৃ: ১০০)**

দোয়াপ্রার্থী: **Pervez Hossain Sb, Bolpur, Birbhum**

জন্য আদিষ্ট ছিল এবং তিন'শ জন ছিল বর্ম পরিহিত। অবশেষে অবরোধের ফলে ত্যাক্ত বিরক্ত হয়ে ইহুদীরা মহানবী (সা.)-এর কাছে নিবেদন করে যে, আমাদের পথ ছেড়ে দিলে আমরা মদীনা থেকে দেশান্তরিত হয়ে আজীবনের জন্য চলে যাব। আর আমাদের মহিলা আর শিশুদেরকে আমাদের জন্য মুক্ত করে দিন, তাদেরকে আমরা আমাদের সাথে নিয়ে যাবো আর অবশিষ্ট ধনসম্পদ আপনারা রেখে দিন, সম্পদের মাঝে যুদ্ধাস্ত্র ইত্যাদিও অন্তর্ভুক্ত হবে। মহানবী (সা.) ইহুদীদের এই শর্ত মঞ্জুর করেন এবং তাদেরকে মদীনা থেকে বের হয়ে যাওয়ার নির্দেশ দেন। সীরাতুল হালাবীয়াতে এভাবে উল্লেখ রয়েছে।

(আসসীরাতুল হালবিয়া, ২য় খণ্ড, পৃ: ২৮৫ ও ২৮৭)

অধিকাংশ সীরাত গ্রন্থে এটিও লেখা রয়েছে যে, আব্দুল্লাহ্ বিন উবাই বিন সলূলের বরাতে এই রেওয়ায়েত যে, তখন সে মহানবী (সা.) -এর কাছে বারবার আসতে থাকে। সে যেহেতু বনু কায়নুকার মিত্র ছিল তাই সে বারবার সুপারিশ এবং অনু নয়-বিনয় করে আর বিভিন্নভাবে এ বিষয়টি প্রকাশ করে যে, আপনি অনুগ্রহকরে বনু কায়নুকাকে ক্ষমা করে দিন, তাদেরকে হত্যা করবেন না এবং তাদেরকে যেতে দিন আর তাদেরকে ক্ষমা করে দিন।

(সুবুলুল হুদা ওয়ার রিশাদ, ৪র্থ খণ্ড, পৃ: ১৭৯-১৮০) (সীরাত ইবনে হিশাম, পৃ: ৫১৪) (শারাহ যারকানি আলা মোয়াহিবুল লাদুন্নি, ২য় খণ্ড, পৃ: ৩৫১)

এই রেওয়ায়েত দ্বারা এই প্রতীতি সৃষ্টি হয় যে, মহানবী (সা.) তাদেরকে হত্যা করতে মনস্থ করেছিলেন এবং আব্দুল্লাহ্ বিন উবাই বিন সলূলের অনবরত সুপারিশে তাদেরকে ক্ষমা করা হয়েছিল, কিন্তু এটি সঠিক নয়।

মহানবী (সা.) কখনো তাদের নারী, শিশু বা তাদেরকে হত্যা করার সংকল্প করেন নি। বস্তুতঃ এ ধরনের যেসব রেওয়ায়েত আছে সেগুলো সন্দেহযুক্ত। অতএব এধরনের রেওয়ায়েতগুলো বিচার-বিশ্লেষণ করে একজন ইতিহাসবিদ সৈয়্যদ বরকত আহমদ তার গ্রন্থে লিখেন, ইহুদীদের অস্ত্র সমর্পনের পর আব্দুল্লাহ বিন উবাই যখন মহানবী (সা.)-এর সমীপে এসে বলল, আমার লোকদের প্রতি বিনম্র আচরণ করবেন; তখন মহানবী (সা.) বললেন, "তোমার অমঙ্গল হোক! আমার (বিষয় আমার ওপর) ছেড়ে দাও।" ইবনে উবাই উত্তরে বলে, "কক্ষনো না। আল্লাহর কসম! আমি ততক্ষণ পর্যন্ত আপনাকে যেতে দিব না যতক্ষণ পর্যন্ত না আপনি আমার লোকদের সাথে নম্র আচরণ করবেন। আপনি কি তাদেরকে সমূলে বিনাশ করবেন? খোদার কসম! আমি দৃঢ় বিশ্বাস রাখি, পরিস্থিতি অবশ্যই পরিবর্তন হবে।" মহানবী (সা.) বললেন, "ভালো কথা! তবে তুমিই তাদেরকে নিয়ে যাও।" ইবনে ইসহাক, ওয়াকদী এবং ইবনে সা'দ এই তিনজন এই কাহিনী বর্ণনা করেছেন। এই তিনজনের (লেখা) পাঠ করে এই ধারণার উদয় হয় যে, মহানবী (সা.)-এর ওপর আব্দুল্লাহ বিন উবাই-এর কিছুটা প্রভাব ছিল, কিন্তু আব্দুল্লাহ বিন উবাইয়ের স্বীয় সুপারিশের বাক্যগুলো সংশয়পূর্ণ বলে মনে হয়। ইবনে ইসহাকের বর্ণনায় এটি কোনো ভাবেই প্রকাশ পায় না যে, মহানবী (সা.) এমন কোনো কথা বলেছেন যার দ্বারা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় যে, তিনি (সা.) বনু কায়নুকা'কে সমূলে বিনাশ করার সংকল্প করেছিলেন। আবার এটি ঐতিহাসিকভাবে প্রমাণিতও নয়। ওয়াকদির বর্ণনায় অবশ্য এই সংকল্পের প্রতি ইঙ্গিত পাওয়া যায় আর এই বিষয়টি ইবনে সা'দও পুনরাবৃত্তি করেছেন। কিন্তু এ-ক্ষেত্রে আমাদের মাথায় এ কথা অবশ্যই রাখা উচিত যে, তিনি (সা.) একজন রাষ্ট্রের অধিপতি হওয়া সত্ত্বেও শত্রুর সাথে কখনো অযথা কঠোর আচরণ করেন নি। তিনি (সা.) কঠোরতা অপছন্দ করতেন। তিনি (সা.) বাধ্য হয়েই যুদ্ধ ক্ষেত্রে যেতেন এবং সেখানেও অপ্রয়োজনীয় রক্তপাত এড়িয়ে চলতেন।

(রসুলে আকরম (সা.) অউর ইহুদ হাজ্জাজ, প্রণেতা- সৈয়্যদ বরকাত আহমদ, পৃ: ৯৮-৯৯)

যাহোক অবরোধ তো করা হয়েছিল এবং তারা আশ্রয় প্রার্থনা করেছিল। এ কারণে বনু কায়নুকা'কে দেশান্তরিতও করা হয়। এর বিস্তারিত বিবরণ হলো, এই ইহুদী গোত্রের আবেদনের প্রেক্ষিতে তাদেরকে দেশান্তরিত করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। মহানবী (সা.) ইহুদীদেরকে মদীনা থেকে দেশান্তরিত করার দায়িত্ব হযরত উবাদা বিন সামেত (রা.)-কে প্রদান করেন এবং মদীনা ছেড়ে যাওয়ার জন্য তিন দিন সময় দেন। অতএব তারা তিন দিনের মধ্যে মদীনা ছেড়ে চলে যায়। এক বর্ণনা য়দেখা যায়, ইহুদীরা হযরত উবাদা (রা.)-এর কাছে আরো কিছু সময় যাচনা করেছিল কিন্তু মহানবী (সা.) তাদেরকে এক ঘন্টাও অতিরিক্ত সময় দেন নি আর নিজ তত্ত্বাবধানে দেশান্তরিত করেছেন। এই (ইহুদী) লোকেরা সেখান থেকে বের হয়ে সিরিয়ার 'আযরিয়াত' অঞ্চলে চলে যায়। (এটি) সিরিয়ার একটি শহর। এক বর্ণনায় এটিও দেখা যায়, হযরত মুহাম্মদ বিন মু সলেমাহ (রা.)-কে দেশান্তরিত করার নির্দেশ প্রদান করেছিলেন। খুব সম্ভবত উভয়কেই এই দায়িত্ব প্রদান করা হয়েছিল।

যাহোক ইহুদীরা চলে যাওয়ার পর তাদের বসতি থেকে বিপুল পরিমাণ অস্ত্র সস্ত্র লাভ হয়। কেননা তারা অপরাপর ইহুদীদের তুলনায় অধিক সম্পদশালী, সবচেয়ে বেশি সাহসী এবংযুদ্ধবাজ লোক ছিল। মহানবী (সা.) তাদের অস্ত্রগুলো থেকে নিজের জন্য তিনটি ধনুক, দুটি বর্ম, তিনটি তরবারি এবং তিনটি বর্শা পছন্দ করে নেন। ধনুকগুলোর নাম হলো 'কাতুম', 'রোহা' এবং 'বেয়যা'। কাতুম উহুদের যুদ্ধে ভেঙ্গে যায়। দুটি বর্মের নাম হলো 'সাগদিয়া' এবং 'ফিযা'। অনুরূপভাবে তিনটি বর্শা এবং তিনটি তরবারি পছন্দ করেন। একটি তরবারিকে 'ওলী', দ্বিতীয়টিকে 'বাতার' বলা হতো এবং তৃতীয়টির কো নো নাম ছিল না। এগুলো 'সীরাতে হালবিয়া'র বর্ণনা।

(আসসীরাতুল হালবিয়া, ২য় খণ্ড, পৃ: ২৮৭) (মুজামুলি বালদান, ১ম খণ্ড, পৃ: ১৬৫)

'সীরাতে খাতামান্নাবীঈন'-এ বনু কায়নুকা'র যুদ্ধের বিবরণ এভাবে বর্ণিত আছে যে, মহানবী (সা.) যখন মক্কা থেকে হিজরত করে মদীনায় আসেন তখন মদীনায় ইহুদীদের তিনটি গোত্র বসবাস করতো। এই তিনটি গোত্রের নাম ছিল যথাক্রমে বনু কায়নুকা', বনু নাযীর এবং বনু কুরায়যা। মহানবী (সা.) মদীনায় আগমন করেই এই গোত্রগুলোর সাথে শান্তি ও নিরাপত্তার চুক্তি করেন এবং পারস্পরিক সন্ধি ও নিরাপত্তার সাথে বসবাস করার ভিত্তি রাখেন। চুক্তি অনুযায়ী উভয়পক্ষ এই বিষয়ে দায়বদ্ধ ছিল যে মদীনাতে শান্তি ও নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠিত রাখবে। যদি কোন বহিঃশত্রু মদীনায় আক্রমণ করে তাহলে সবাই মিলে তার মোকাবিলা করবে। প্রথম প্রথম ইহুদীরা এই চুক্তি মেনে চলে আর কমপক্ষে বাহ্যত তারা মুসলমানদের সাথে কোন ঝগড়া-বিবাদ সৃষ্টি করে নি। কিন্তু যখন তারা দেখলো মুসলমানরা ক্রমশ মদীনাতে ক্ষমতা অর্জন করে চলেছে তখন তাদের আচরণ পরিবর্তন হতে শুরু করলো। তারা মুসলমানদের এই ক্রমবর্ধমান শক্তিকে রুখে দেওয়ার সংকল্প করে এবং এই উদ্দেশ্যে তারা সব ধরণের বৈধ ও অবৈধ পন্থা অবলম্বন শুরু করলো। এমনকি তারা এই বিষয়ের চেষ্টা করতেও দ্বিধা করে নি যে মুসলমানদের মাঝে বিভেদ সৃষ্টি করে গৃহযুদ্ধ শুরু করিয়ে দেয়। রেওয়াতে বর্ণিত হয়েছে একবার আওস ও খাযরাজ গোত্রের অনেক লোক একত্রে বসে পরস্পর ভালোবাসা ও সৌহার্দের সাথে আলোচনা করছিল। কিছু বিশৃঙ্খলা সৃষ্টিকারী ইহুদী সেই বৈঠকে পৌঁছে বু আস যুদ্ধের উল্লেখ শুরু করলো। এটি সেই ভয়ানক যুদ্ধ ছিল যা হিজরতের কয়েক বছর পূর্বে এই দুই গোত্রের মাঝে সংঘটিত হয়েছিল, আর এতে আওস ও খাযরাজ গোত্রের অনেক লোক একে অপরের হাতে নিহত হয়েছিল। যেভাবে পূর্বেই এর বিস্তারিত বিবরণ দেওয়া হয়েছে। এই যুদ্ধের উল্লেখ আসতেই কিছু আবেগপ্রবণ লোকদের মনে পুরানো স্মৃতি জাগ্রত হলো এবং অতীতের বিদ্বেষের দৃশ্য চোখে ভাসতে লাগলো। ফলাফল এমন হলো যে পারস্পরিক তির্যক বাক্যালাপের গন্ডি পেরিয়ে এই বৈঠকেই মুসলমানদের মাঝে তরবারি ধারণের ঘটনা ঘটে। সৌভাগ্যের বিষয় মহানবী (সা.) যথাসময়ে এর সংবাদ লাভ করেন এবং মুহাজেরদের একটি দলকে সাথে নিয়ে তৎক্ষণাত ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয়ে উভয়পক্ষকে বুঝিয়ে শান্ত করেন আর তিরস্কার করে বলেন, তোমরা আমার উপস্থিতিতে অজ্ঞতার পথ অবলম্বন করছো! খোদার এই নেয়ামতকে স্মরণ করছো না যে, তিনি তোমাদেরকে ইসলামের মাধ্যমে পরস্পর ভাই -ভাই বানিয়ে দিয়েছেন! আনসারদের ওপর তাঁর উপদেশের এমন প্রভাব পড়ে যে তাদের চোখ থেকে অশ্রু প্রবাহিত হয় এবং তারা নিজেদের এই আচরণ থেকে তওবা করে একে অপরকে আলিঙ্গন করে।

যখন বদরের যুদ্ধ সংঘটিত হয় আর আল্লাহ্ তা'লার অনুগ্রহে মুসলমানরা উপায় উপকরণের স্বল্পতা সত্ত্বেও কুরায়েশদের একটি বিরাট সশস্ত্র সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে জয়লাভ করে আর মক্কার বড়ো বড়ো নেতারা ধুলোয়

যুগ ইমামের বাণী

ইসলামের সুরক্ষা এবং সত্যের উদ্ঘাটনের জন্য সর্বপ্রথম তোমরা প্রকৃত মুসলমানের নমুনা হয়ে দেখাও।

(মালফুযাত , ৪র্থ খণ্ড, পৃ: ৬১৫)

দোয়াপ্রার্থী: Saeen Mir and Family, Kogram, Nalhati (Birbhum)

যুগ ইমামের বাণী

যাঁর আশিস ও কল্যাণের ধারা সদা প্রবাহমান, তিনিই হলেন জীবিত নবী। (মালফুযাত, ৪র্থ খণ্ড, পৃ: ৬২৯)

দোয়াপ্রার্থী: Qazi Abdur Rashid, Basantapur, 24 PGS (S)

মিশে যায়; তখন মদীনার ইহুদীদের হিংসার আগুণ প্রজ্বলিত হয়। তারা মুসলমানদের সাথে প্রকাশ্যে ঝগড়া-বিবাদ শুরু করে দেয় এবং বৈঠকে প্রকাশ্যে বলা আরম্ভ করে যে, কুরায়েশদের সেনাবাহিনীকে পরাজিত করেছ তো কী হয়েছে! আমাদের সাথে মুহাম্মদের (সা.) এর যুদ্ধ হলে আমরা দেখিয়ে দিতাম কীভাবে যুদ্ধ করতে হয়। এমনকি একটি বৈঠকে তারা রসূলুল্লাহ (সা.) এর মুখের ওপর এমন শব্দ উচ্চারণ করে বসে। রেওয়াতে বর্ণিত হয়েছে, বদরের যুদ্ধের পর যখন মহানবী (সা.) মদীনায় ফিরে আসেন, একদিন তিনি (সা.) ইহুদীদেরকে একত্রিত করে তাদেরকে উপদেশ দেন এবং নিজের দাবি উপস্থাপন করে ইসলামের দিকে আহবান করেন। তাঁর (সা.) এই শান্তিপূর্ণ ও সহানুভূতিপূর্ণ বক্তৃতার ইহুদী নেতারা এভাবে উত্তর দেয়, হে মুহাম্মদ (সা.)! তুমি হয়তোবা গুটিকয়েক কুরায়েশকে হত্যা করে অহংকারী হয়ে গেছ, তারা যুদ্ধের কলাকৌশল সম্পর্কে অজ্ঞ ছিল। যদি আমাদের সাথে তোমার যুদ্ধ হয় তাহলে তুমি বুঝতে পারবে যুদ্ধ কিভাবে করতে হয়! ইহুদীরা সাধারণ হুমকিতেই থেমে গিয়েছিল এমন নয়, বরং এমন মনে হয় যে তারা মহানবী (সা.) কে হত্যার ষড়যন্ত্রও করতে আরম্ভ করেছিল। কেননা এটিও বর্ণিত হয়েছে যে, সে সময় একজন নিষ্ঠাবান সাহাবী হযরত তালহা বিন বারআ (রা.) মৃত্যু পথযাত্রী অবস্থায় ছিলেন তিনি ওসীয়্যত করেন, আমি যদি রাতেই মারা যাই তাহলে জানাযার নামাযের জন্য তোমরা মহানবী (সা.) কে খবর দিবে না। কেননা এমন যেন না হয় যে আমার কারণে মহানবী (সা.) -এর উপর ইহুদীরা কোন আক্রমণ করে বসে। যাহোক বদরের যুদ্ধের পর ইহুদীরা প্রকাশ্যে শত্রুতা শুরু করে দেয় আর মদীনার ইহুদীদের মধ্যে বনু কায়নুকা যেহেতু সবচেয়ে শক্তিশালী ও সাহসী ছিল, এজন্য সর্বপ্রথম তাদের পক্ষ থেকেই চুক্তি ভঙ্গের সুত্রপাত হয়।

ঐতিহাসিকগণ লিখেন মহানবী (সা.) ও মদীনার ইহুদীদের মধ্যে যে চুক্তি হয়েছিল সর্বপ্রথমে বনু কায়নুকা সে চুক্তি ভঙ্গ করে এবং বদরের যুদ্ধের পর তারা অনেক বেশী বিদ্রোহ শুরু করে ও প্রকাশ্যে হিংসা-বিদ্বেষের বহিঃপ্রকাশ করতে শুরু করে এবং নিজেদের অঙ্গীকার ও চুক্তি ভঙ্গ করে।

কিন্তু তাদের এই সমস্ত আচরণ সত্ত্বেও মুসলমানরা নিজ নেতা ও মনিবের পথনির্দেশনা অনুযায়ী সব দিক থেকে ধৈর্য্য প্রদর্শন করে এবং নিজেদের পক্ষ থেকে আগ বাড়িয়ে কিছু করেনি। কিন্তু হাদীসে এসেছে ইহুদীদের সাথে কৃত এই চুক্তির পর মহানবী (সা.) ইহুদীদের মনস্তুষ্টির বিশেষ খেয়াল রাখতেন।

তাদের পক্ষ থেকে শত্রুতামুলক আচরণ ছিল কিন্তু মহানবী (সা.) -এর পক্ষ থেকে ছিল মনস্তুষ্টির আচরণ। যাহোক একবার একজন মুসলমান ও এক ইহুদীর মধ্যে একটি বিতর্কের সৃষ্টি হয়। সেই ইহুদী হযরত মূসা (আ.) কে সকল নবীর উপর শ্রেষ্ঠ বলে আখ্যায়িত করে, এতে সেই সাহাবী রাগান্বিত হয়ে যান আর সেই ইহুদীর সাথে কিছুটা কঠোরতা করেন এবং মহানবী (সা.) কে সকল রসূলের মধ্যে শ্রেষ্ঠ হিসেবে ঘোষণা করেন। মহানবী (সা.) যখন এই ঘটনা জানতে পারেন তখন তিনি (সা.) অসন্তুষ্ট হন এবং সেই সাহাবীকে ভর্ৎসনা করে বলেন, এটি তোমার কাজ নয় যে তুমি আল্লাহ্‌র এক রসূলকে অন্য রসূলের উপর শ্রেষ্ঠ ঘোষণা করে বেড়াবে। এরপর মহানবী (সা.) হযরত মূসা (আ.) -এর একটি কোন একটি ক্ষেত্রে শ্রেষ্ঠত্ব বর্ণনা করে সেই ইহুদীর মন রক্ষা করলেন। কিন্তু এই মনস্তুষ্টির আচরণ সত্ত্বেও ইহুদীরা নিজেদের ষড়যন্ত্রে আরো অগ্রসর হতে থাকে এবং পরিশেষে ইহুদীদের পক্ষ থেকেই যুদ্ধের কারণ সৃষ্টি হয়। আর তাদের অন্তরের শত্রুতা তাদের বক্ষে লুকায়িত থাকতে পারেনি। আর এটি এভাবে হয় যে একবার এক মুসলমান মহিলা বাজারে এক ইহুদীর দোকানে কিছু দ্রব্য-সামগ্রী ক্রয় করতে যায়। যেভাবে বিস্তারিত বর্ণনা করা হয়েছে। তখন সেই দোকানে বসে থাকা কয়েকজন লম্পট ইহুদী সেই মহিলাকে নিতান্ত আপত্তিকরভাবে উত্যক্ত করতে থাকে। আর সেই ইহুদী দোকানদার নিজেও এই দুষ্টামি করে যে, সে ঐ মহিলার পরিধেয় কাপড়ের নিচের একটি অংশকে তার অজান্তে তার পিঠের কাপড়ের সাথে একটি পিনের সাহায্যে আঁটকে দেয়। এর ফলে সেই মহিলা যখন তাদের এই লাম্পট্য ও বখাটেপনা দেখে সেখান থেকে চলে আসার জন্য উঠে দাঁড়ায় তখন উলঙ্গ হয়ে যায়। আর এই দৃশ্য দেখে সেই ইহুদী দোকানদার ও তার সাঙ্গপাঙ্গারা অট্টহাসিতে ফেটে পড়ে। তখন সেই মুসলমান মহিলা লজ্জায় চিৎকার দিয়ে উঠে এবং সাহায্য চায়। ঘটনাক্রমে একজন মুসলমান তখন নিকটেই ছিল। সে চিৎকার শুনে দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছায় ও সেই দোকানদারের সাথে পারস্পরিক মারামারিতে সেই ইহুদী দোকানদার মারা যায়। এর ফলে চারদিক থেকে সেই মুসলমানের উপর তরবারির আক্রমণ শুরু হয় আর সেই আত্মাভিমানী মুসলমান সেখানেই মৃত্যুবরণ করে। মুসলমানরা যখন এই ঘটনা জানতে পারে তখন জাতিগত আত্মাভিমানে তারা ভীষণ ক্ষুব্ধ হয়ে উঠে, আর অপরদিকে ইহুদীরা যারা এই ঘটনাকে বিশৃঙ্খলার অজুহাত বানাতে চেয়েছিল তারাও একত্রিত হয়ে যায় এবং একটি দাঙ্গার পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়ে যায়। মহানবী (সা.) যখন এই পরিস্থিতি সম্পর্কে অবহিত হন তখন বনু কায়নুকা'র নেতৃবর্গকে একত্রিত করে তাদের উদ্দেশ্যে বললেন, এই পদ্ধতি ভালো নয়। মহানবী (সা.)-এর আচরণ দেখুন! তিনি (সা.) কিভাবে এই দাঙ্গার পরিস্থিতিকে শান্ত করার চেষ্টা করেছেন। তিনি (সা.) ইহুদীদের উদ্দেশ্যে বলেন, তোমরা এই দুষ্টামি ও নোংরামি থেকে বিরত হও এবং আল্লাহ্ তা'লাকে ভয় কর। এ কথা শুনে তারা লজ্জিত ও অনুতপ্ত হয়ে ক্ষমা প্রার্থনা তো করেইনি বরং ঔদ্ধত্যপূর্ণ উত্তর প্রদান করে এবং মুসলমানদেরকে আবারো সেই হুমকি দেয়, তোমরা বদরের বিজয়ের অহংকার করো না আমাদের সাথে মোকাবিলা হলে বুঝতে পারবে যে যোদ্ধারা এমনই হয়ে থাকে। নিরুপায় হয়ে মহানবী (সা.) সাহাবাদের একটি দলকে নিয়ে বনু কায়নুকা' এর দুর্গের দিকে রওনা দিলেন। এটি এখন তাদের নিজ কর্মের জন্য অনুশোচনা করার শেষ সুযোগ ছিল। যখন তিনি (সা.) রওনা দিলেন তখনও ক্ষমা চেয়ে নিলে বিষয়টি মিটে যেত। কিন্তু তারা প্রকাশ্যে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত ছিল। মোটকথা যুদ্ধের সূচনা হয়ে গেল এবং ইসলাম ও ইহুদী ধর্মের শক্তিসমূহ একে অপরের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে গেল। সে যুগের রীতি অনুসারে যুদ্ধের এটাও একটা পদ্ধতি ছিল যে নিজেদের দুর্গে বন্দী হয়ে অবস্থান করতো। বিরোধী পক্ষ দুর্গ অবরোধ করতো। সুযোগ বুঝে সময়ে সময়ে একে অপরের ওপর আক্রমণ করতে থাকতো। এমনকি হয় দুর্গ অবরোধকারী সেনাবাহিনী দুর্গ দখল করা থেকে হতাশ হয়ে অবরোধ উঠিয়ে নিতো আর এটি দুর্গে অবরুদ্ধ বাহিনীর বিজয় বলে মনে করা হতো। অথবা দুর্গে আবদ্ধ পক্ষ প্রতিদ্বন্দ্বিতার উপায় না করতে পেরে দুর্গের ফটক খুলে দিয়ে নিজেদেরকে বিজয়ীদের হাতে সোপর্দ করতো। এই ঘটনাতেও বনু কায়নুকা' এই পদ্ধতিই অবলম্বন করে এবং নিজেদের দুর্গে আবদ্ধ হয়ে যায়। মহানবী (সা.) তাদের অবরুদ্ধ করেন এবং পনেরো দিন পর্যন্ত একাধারে অবরোধ অব্যাহত থাকে। পরিশেষে যখন বনু কায়নুকা'র সমস্ত ক্ষমতা ও দর্প চূর্ণ হয়ে যায় তখন তারা এই শর্তে নিজেদের দুর্গের ফটক খুলে দেয় যে, তাদের সম্পদ মুসলমানদের নিয়ন্ত্রণে যাবে, কিন্তু তাদের প্রাণ ও তাদের পরিবারের ওপর মুসলমানদের কোন কতৃর্ত্ব থাকবে না। মহানবী (সা.) তাদের এই শর্ত মেনে নেন। যদিও মূসা (আ.) এর শরীয়ত অনুযায়ী এরা সবাই হত্যাযোগ্য অপরাধী ছিল এবং চুক্তি অনুযায়ী তাদের জন্য মূসা (আ.) এর শরীয়তের সিদ্ধান্তই কার্যকর হবার কথা, তথাপি যেহেতু এটি সেই জাতির প্রথম অপরাধ ছিল আর মহানবী (সা.) এর কোমল প্রকৃতি চূড়ান্ত শাস্তির দিকে যা শেষ চিকিৎস প্রাথমিক পর্যায়ে ঝুঁকতে পারতো না। আবার অপরদিকে এমন চুক্তি ভঙ্গকারী ও শত্রু গোত্রের মদীনাতে বসবাস করাও ঘরের শত্রু বিভীষণের চেয়ে কম ছিল না; বিশেষত যখন আওস ও খাযরাজ গোত্রে মুনাফেকদের একটি দল পূর্ব থেকেই মদীনাতে বিদ্যমান ছিল। অপরদিকে বহিঃশক্তির মাঝে সমগ্র আরবের বিরোধীতা মুসলমানদের নাভিশ্বাস উঠিয়ে রেখেছিল। এমতাবস্থায় মহানবী (সা.) এর সিদ্ধান্ত এটাই হতে পারতো যে বনু কায়নুকা' মদীনা থেকে বিতাড়িত হবে। এই শাস্তি তাদের অপরাধের তুলনায় উপরন্তু, সে যুগের পরিস্থিতিকে দৃষ্টিপটে রেখে অত্যন্ত লঘু শাস্তি ছিল। প্রকৃতপক্ষে এতে শুধু আত্মরক্ষার দিকটিকেই লক্ষ্য রাখা হয়েছিল। নতুবা আরবদের যাযাবর গোত্রগুলোর জন্য স্থানান্তর হওয়া কোন বড়ো বিষয় ছিল না। বিশেষত যখনকিনা কোন গোত্রের সম্পত্তি জমি, বাগান রূপে না থাকে; আর বনু কায়নুকা'র এমনটি ছিল না। তাদের যা সম্পদ কোনটাই এমন ছিল না যা জমি বা স্থাবর, যার ওপর তাদের পুরোপুরি নির্ভরতা রয়েছে। আবার পুরো গোত্রকে পূর্ণ শান্তি ও নিরাপত্তার সাথে এক স্থান থেকে অন্য স্থানে গিয়ে বসতি স্থাপনের সুযোগ দেওয়া হয়। বনু কায়নুকা' পূর্ণনিরাপত্তার সাথে মদীনা ছেড়ে দিয়ে সিরিয়ার দিকে চলে যায়। তাদের যাত্রা করা সম্পর্কে আবশ্যিক বিষয়সমূহের ব্যবস্থাপনা ও তদারকির দায়িত্ব মহানবী (সা.) নিজের সাহাবী উবাদা বিন সামেতের (রা.) ওপর অর্পণ করেন। যিনি তাদের মিত্র ছিলেন। উবাদা বিন সামেত (রা.) বনু কায়নুকা' সাথে কিছুদূর পর্যন্ত যান এবং এরপর তাদের নিরাপত্তার সাথে রওনা করিয়ে দিয়ে ফেরত চলে আসেন। যুদ্ধলব্ধ সম্পদ যা মুসলমানদের হস্তগত হয় সেটা শুধু যুদ্ধাস্ত্র ও স্বর্ণকারের পেশার যন্ত্রপাতি ছিল।

কিছু রেওয়াতে বনু কায়নুকা'-এর ব্যাপারে উল্লেখ পাওয়া যায়, যখন তারা নিজেদের দুর্গের ফটক খুলে নিজেদেরকে মহানবী (সা.) এর সোপর্দ

মসীহ মওউদ (আ.)-এর বাণী

" তুচ্ছ এ জীবন যাকে নিয়ে এত গর্ব করা হয়। চিরন্তন আনন্দের জীবন সেটিই যা মৃত্যুর পর লাভ হয়।"

(মমালফুযাত, ৪র্থ খণ্ড, পৃ: ৬১৬)

দোয়াপ্রার্থী: Azkarul Islam, jamat Ahmadiyya Amaipur (Birbhum)

করে দেয় তখন তাদের অঙ্গীকার ভঙ্গ, বিদ্রোহ ও ষড়যন্ত্রের কারণে তিনি (সা.) তাদের যুদ্ধ করতে সক্ষম পুরুষদেরকে হত্যার সংকল্প করেন। কিন্তু মুনাফিকদের সর্দার আব্দুল্লাহ্ বিন উবাই বিন সলুলের সুপারিশে তিনি (সা.) এই অভিপ্রায়পরিত্যাগ করেন, কিন্তু গবেষকরা এই রেওয়ায়েতকে সঠিক বলে গণ্য করেনি। কেননা অন্যান্য রেওয়ায়েতে স্পষ্ট উল্লেখ আছে, বনু কায়নোকা এ শর্তে দরজা খুলেছিল যে, তাদের ও তাদের স্ত্রী-সন্তানদের প্রাণে ক্ষমা করে দেয়া হবে। অতএব এটি কখনো হতে পারে না যে, মহানবী (সা.) এ শর্ত মেনে নেয়ার পর অন্য কোন পদ্ধতি অবলম্বন করবেন এবং এই শর্ত ভঙ্গ করবেন। অধিকন্তু বনু কায়নোকার পক্ষ থেকে প্রাণভিক্ষার শর্ত উপস্থাপন হওয়া এ বিষয়টিই সাব্যস্ত করে যে, তারা নিজেরাই অনুধাবন করেছিল, তাদের প্রকৃত শাস্তি মৃত্যুদন্ড অবধারিত। কিন্তু তারা মহানবী (সা.) এর পক্ষ থেকে দয়ার প্রত্যাশী ছিল এবং তাদেরকে মৃত্যুদন্ডের শাস্তি দেওয়া হবে না এরূপ প্রতিশ্রুতি প্রাপ্তির পর তারা নিজেদের দুর্গের দরজা খুলতে চেয়েছিল। যদিও মহানবী (সা.) নিজ কৃপাবশতঃ তাদেরকে ক্ষমা করে দিয়েছেন, কিন্তু প্রতীয়মান হয় যে, খোদা তা'লার দৃষ্টিতে এরা নিজেদের অপকর্ম ও অপরাধের কারণে পৃথিবীর বুকে স্থায়িত্ব লাভের যোগ্যতা হারিয়ে ফেলে। সুতরাং বর্ণিত হয়েছে, তারা দেশান্তরিত হয়ে যেখানে গিয়েছিল সেখানে এক বছর অতিবাহিত হওয়ার পূর্বেই তাদের মাঝে এমন এক ব্যাধি ছড়িয়ে পড়ে যার শিকারে পরিণত হয়ে পুরো গোত্র ধ্বংস হয়ে যায়।

বনু কায়নোকার যুদ্ধের ইতিহাস সম্পর্কে কিছুটা মতবিরোধ রয়েছে। ওয়াকদি এবং ইবনে সা'দ (যুদ্ধের সময়কাল) দ্বিতীয় হিজরির শাওয়াল মাস বর্ণনা করেছেন। পরবর্তীতে আগত অধিকাংশ ঐতিহাসিকও এটি সমর্থন করেছেন। কিন্তু ইবনে ইসহাক এবং ইবনে হিশাম একে গাযওয়ায়ে সাভিক (ছাতুর যুদ্ধ)-এর পর রেখেছেন যা সর্বস্বীকৃত মত অনুযায়ী দ্বিতীয় হিজরির যিলহজ্জ মাসের শুরুতে সংঘটিত হয়েছিল। এছাড়া হাদিসের একটি রেওয়ায়েতে ইঙ্গিত রয়েছে, বনু কায়নোকার যুদ্ধ হযরত ফাতেমার রুখসাতানার পর সংঘটিত হয়েছিল কেননা এ রেওয়ায়েতে এটি বর্ণিত হয়েছে, হযরত আলী (রা.) তার ওলীমার দাওয়াতের খরচ সরবরাহের জন্য এ প্রস্তাব দিয়েছিলেন যে, তিনি বনু কায়নোকার এক ইহুদি স্বর্ণকারকে সাথে নিয়ে জঙ্গালে গিয়ে ইযখির ঘাস কেটে এনে মদীনায় স্বর্ণকারদের কাছে বিক্রি করবেন। যার মাধ্যমে এটি প্রমাণিত হয় যে, হযরত ফাতেমার রুখসাতানার সময় যা সাধারণ ঐতিহাসিকদের মতে দ্বিতীয় হিজরির যিলহজ্জ মাসে হয়েছিল তখনও পর্যন্ত বনু কায়নোকা মদীনায়ই বসবাস করত। এ কারণগুলোর উপর ভিত্তি করে হযরত মির্যা বশীর আহমদ সাহেব বলেন, আমি বনু কায়নোকার যুদ্ধের উল্লেখ গাযওয়ায়ে সাভিক (ছাতুর যুদ্ধ) এবং হযরত ফাতেমার রুখসাতানার পর দ্বিতীয় হিজরির শেষের দিকে লিপিবদ্ধ করেছি।

এস্থলে এটি উল্লেখ করাও অযৌক্তিক হবে না যে, বনু কায়নোকার যুদ্ধের কারণ বর্ণনা করতে গিয়ে মিস্টার মার্গোলিস নিজের পক্ষ থেকে বানিয়ে এরূপ এক আশ্চর্যজনক কথা লিপিবদ্ধ করেছে কোন রেওয়ায়েতে ঘুণাক্ষরেও যার উল্লেখ পাওয়া যায় না। বুখারীতে একটি রেওয়ায়েত বর্ণিত হয়েছে, হযরত হামযা মদের নেশায় (তখনো পর্যন্ত মদ হারাম ঘোষণা হয়নি) হযরত আলীর সেই উটটিকে হত্যা করেছিলেন যা তিনি বদরের যুদ্ধে লাভ করেছিলেন। এই একক ঘটনাটিকে কোন ধরণের ঐতিহাসিক সনদ ছাড়া বনু কায়নোকার যুদ্ধের সাথে সম্পৃক্ত করে মিস্টার মার্গোলিস লিখেছে, মহানবী (সা.) বনু কায়নোকা গোত্রের বিরুদ্ধে এ উদ্দেশ্যে অভিযান পরিচালনা করেছিলেন যেন এ যুদ্ধে প্রাপ্ত মালে গণিমতের মাধ্যমে হযরত আলীর ক্ষতিপূরণ প্রদান করা হয়। অবিশ্বাস্য এক কথার অবতারণা করেছে। ইতিহাস রচনায় সম্ভবত একমাত্র সে-ই এতটা দুঃসাহস দেখিয়েছে। এছাড়া মজার বিষয় হল, মিস্টার মার্গোলিস এ কথার সমর্থন করেছে যে, আমি এ ঘটনাটি নিজের পক্ষ থেকে ধারণা করে অতিরিক্ত হিসেবে লিখেছি। "(সীরাত খাতামান্নাবীঈন, প্রণেতা,-মির্যা বশীর আহমদ এম. পৃ: ৪৫৭-৪৬২)

কোন সূত্র পাওয়া যায়নি কিন্তু আমার মনে হল তাই লিখলাম যে, আর কোন কারণ ছিল না, কেবলমাত্র গোত্রের দু'চারটি উটের মুল্য আদায়ের জন্য যুদ্ধ করা হয়েছে। অদ্ভুত সব চিন্তা-ভাবনা! প্রাচ্যবিদ বা অমুসলিম ঐতিহাসিকরা মুসলমানদের ব্যাপারে বিদ্বেষ ও শত্রুতায় এতটাই চরম ভাবাপান্ন যে, ইতিহাসকে বিকৃত করে উপস্থাপন করা তাদের জন্য অত্যন্ত সহজ ব্যাপার আর এমনটিই অধিকাংশ ক্ষেত্রে পরিলক্ষিত হয়। যাহোক, এ বিষয়ে অবশিষ্ট আলোচনা পরবর্তীতে হবে ইনশাআল্লাহ্।

সাম্প্রতিক বৈশ্বিক পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে আমি পুনরায় দোয়ার জন্য স্মরণ করিয়ে দিই। হামাস-ইসরাঈলের যুদ্ধ ও এর পরিণামে নিরীহ ফিলিস্তিনী নারী, শিশুদের শাহাদাতের ঘটনা বৃদ্ধি পাচ্ছে।

যুদ্ধ পরিস্থিতি যেভাবে দ্রুতগতিতে তীব্র আকার ধারণ করছে আর ইসরাঈল সরকার এবং পরাশক্তিগুলোকে যে নীতি অবলম্বন করতে দেখা যাচ্ছে ফলতঃ এখন বিশ্বযুদ্ধ দুয়ারে অপেক্ষমান বলে মনে হচ্ছে আর বর্তমানে কতক মুসলিম রাষ্ট্রপ্রধানও এ কথা নির্দ্বিধায় বলা শুরু করেছে। রাশিয়া, চীনও অনুরূপভাবে পশ্চিমা বিশ্লেষকগণও একথা বলতে এবং লিখতে শুরু করেছে যে, এখন এই যুদ্ধের পরিধি ব্যাপকতর হবে বলে মনে হচ্ছে।

তাৎক্ষণিকভাবে যদি বিচক্ষণতাসুলভ পদক্ষেপ গ্রহণ করা না হয় তবে পৃথিবীর ধ্বংস অনিবার্য। সবকিছু সংবাদে দৃষ্টিপটে আসছে। পরিস্থিতি আপনাদের সামনে রয়েছে। কাজেই আহমদীদেরকে দোয়ার প্রতি দৃষ্টি দেওয়া উচিত। নিশ্চিন্ত হবেন না। এ পরিস্থিতিকে সামনে রেখে প্রতি নামাযে নূন্যতম একটি সিজদা অথবা দিনে ন্যূনতম কোন এক ওয়াক্ত নামাযে একটি সিজদায় দোয়া করা আবশ্যক।

পশ্চিমা বিশ্বের কোন রাষ্ট্রপ্রধানই তো এ ব্যাপারে ন্যায়পরায়ণ ভূমিকা পালন করছে না আর এ বিষয়ে কিছু বলার সাহসও রাখে না। কোন্ দেশের প্রধানমন্ত্রী বা রাষ্ট্রপ্রধান ভাল বা খারাপ; তার এ কথা বলা অসমীচীন আর মুসলমানদের তার বিরুদ্ধে কথা বলা অনুচিত-এ বিতর্কে আহমদীরা জড়াবেন না। এগুলো সব বাজে কথাবার্তা।

যতক্ষণ পর্যন্ত কেউ সাহস করে যুদ্ধবিরতির চেষ্টা না করবে তবে সে নিশ্চিতভাবে পৃথিবীকে ধ্বংসের পানে ধাবিত করার জন্য দায়ী সাব্যস্ত হবে। অতএব নিজ গন্ডিতে দোয়ার সাথে সাথে এই বার্তাটি প্রচারের চেষ্টা করুন যে, অন্যায়-অত্যাচার বন্ধ কর। যদি কোন আহমদীর কারো সাথে কোন সংশ্লিষ্টতা থাকে তবে তাকে বোঝান। এটিই সাহসিকতা, এটিই আল্লাহ্ তা'লার আদেশ পালনের মানদণ্ড। ইসরাঈল সরকারের প্রতিনিধি বলেছে, হামাস আমাদের নিরীহ জনগণকে হত্যা করেছে। আমরা প্রতিশোধ নিব। অথচ এ প্রতিশোধ এখন সকল পর্যায়ে সীমাতিক্রম করে গিয়েছে। বর্ণনা অনুযায়ী যত সংখ্যক ইসরাঈলী প্রাণের ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে তার চেয়ে চার পাঁচগুণ অধিক সংখ্যক ফিলিস্তিনীদের প্রাণের ক্ষতি সাধিত হয়েছে।

তাদের ভাষ্যমতে যদি হামাসকে নিশ্চিহ্নকরার উদ্দেশ্য হতো তবে তাদের সাথে সরাসরি যুদ্ধ করুন। নারী, শিশু, বৃদ্ধদেরকে কেন লক্ষ্যবস্তু বানাচ্ছেন? তাছাড়া তাদেরকে খাদ্য, পানি ও চিকিৎসা থেকে বঞ্চিত করা হচ্ছে। এই রাষ্ট্রগুলোর মানবাধিকার এবং যুদ্ধনীতির যাবতীয় দাবি দাওয়া এখানে এসে থমকে যায়। তবে হ্যাঁ, কতক এদিকেও দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। উদাহরণস্বরূপ বিগত দিনগুলোতে যুক্তরাজ্যের সাবেক প্রেসিডেন্ট ওবামা বলেছিল, যুদ্ধ যদি করতেই হয় তবে সমরনীতিকে দৃষ্টিপটে রেখে যুদ্ধ করা উচিত। বেসামরিক নিরীহ জনগণের ওপর অত্যাচার করা উচিত নয়।

জাতিসংঘের মহাসচিবও একই কথা বলেছিলেন। এটি শুনে ইসরাঈল সরকার হৈ চৈ করে অথচ পৃথিবীর অবশিষ্ট শান্তির দাবিদাররা যারা নিজেদেরকে শান্তি প্রতিষ্ঠার অগ্রদূত, চ্যাম্পিয়ন মনে করে তারা (জাতিসংঘ) মহাসচিবের ভাষণের সমর্থনে টু শব্দ পর্যন্ত করেনি, বিপরীতে অসন্তোষ প্রকাশ করেছে। মোটকথা, পরিস্থিতি ভয়ানক আর ক্রমেই আরো ভয়ংকর হতে যাচ্ছে।

পশ্চিমা মিডিয়া একপক্ষের সংবাদকে অতিরঞ্জিত করে প্রচার করে আর অন্যপক্ষের যে কোন সংবাদ আড়ালে পড়ে যায় যেমন, কয়েক দিন আগে মুক্তিপ্রাপ্ত এক মহিলা বলেছিল, বন্দী অবস্থায় আমার সাথে সদাচরণ করা হয়েছে- এ সংবাদকে আড়াল করে এই সংবাদকে ঢাকঢোল পিটিয়ে প্রচার করেছে যে, হামাসের বন্দীশালা নরকতুল্য।

সার্বিক পরিস্থিতিকে সকলের সামনে রাখাই তো ন্যায়পরায়ণতা। এরপর বিশ্ববাসীকে সিদ্ধান্ত নিতে দিন যে, কে অত্যাচারী এবং কে অত্যাচারিত আর কোন্ সীমা পর্যন্ত এ যুদ্ধ বৈধ আর কোন্ পর্যায়ে এ যুদ্ধ শেষ হওয়া উচিত?

তাই সার্বিক পরিস্থিতি বিশ্ববাসীর দৃষ্টিপটে আসা উচিত, একপক্ষীয় সাক্ষ্য নয়। যাহোক আমাদেরকে দোয়ার প্রতি অধিক মনোযোগ দেওয়া উচিত। অন্যায়-অত্যাচার বন্ধের জন্য নিজ গন্ডিতে চেষ্টা এবং দোয়া করা উচিত। অত্যাচারিত মুসলমানদের জন্যও এবং মুসলমান রাষ্ট্রগুলোর একটি সামগ্রিক ও দূরদর্শিতামূলক পরিকল্পনা তৈরির জন্য দোয়া করা উচিত। মুসলমানদের কষ্ট লাঘবে আমাদের বিশেষ বেদনা থাকা উচিত। আমরা তো সেই মসীহ্ মওউদ (আ.) এর মান্যকারী যিনি মুসলমানদের পক্ষ থেকে আমাদের প্রতি কষ্ট সহ্য করা সত্ত্বেও তাদের প্রতি সহমর্মিতার আবেগের বহিঃপ্রকাশ এভাবে করেছেন যে,হে আমার হৃদয়! তুমি তাদের প্রতি সদয় হও।কেননা তারা তো আমার নবীর প্রতি ভালোবাসারই দাবি করে!

সুতরাং মহানবী (সা.) এর প্রতি ভালবাসার দাবি হলো, আমরা যেন মুসলমানদের জন্য অধিক পরিমাণে দোয়া করি। আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকে এর তৌফিক দিন এবং মুসলমানদেরও এবং বিশ্ববাসীকে বিবেক দিন।

****

ধরা, সমর্থন করা কেবল সম্ভবই নয়, বরং নিঃসন্দেহে অপরিহার্য।

সর্বপ্রথমে, আমাদের নিজেদেরকে অপবিত্রতা ও স্থূলতা এড়ানো উচিত। আমাদের কেবল সেই বিষয়গুলোই দেখা বা সেসবেই অংশ নেওয়া উচিত, যেগুলো ধার্মিকতাকে উৎসাহ দেয়, যেগুলো আমাদের বিশ্বাসকে শক্তিশালী করে এবং সর্বশক্তিমান আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনে যেগুলো আমাদেরকে সক্ষম করে। প্রতিশ্রুত মসীহের মান্যকারী হিসেবে, আমাদেরকে সেই বিষয়গুলিই গ্রহণ করা উচিত যা তার শিক্ষা সম্পর্কে আমাদের জ্ঞান বৃদ্ধি করে, যেগুলো আসলে পবিত্র কুরআন ও মহানবী (সা.)-এরই শিক্ষা।অতএব, আমাদের আধুনিক প্রযুক্তির ইতিবাচক দিকগুলো থেকে লাভবান হওয়া উচিত। আর এগুলোর ক্ষতিকারক ও ধ্বংসাত্মক প্রভাব থেকে নিজেদেরকে বাঁচাতে হবে। এটি দুঃখজনকভাবে সত্য, আমাদের জামা'তের বহু সদস্য যারা পুরুষ ও মহিলা উভয়ই, প্রতিশ্রুত মসীহ্ (আ.)-এর বয়আত গ্রহণ করার পরেও, নিজেদের আধ্যাত্মিক ও নৈতিক সংশোধনের ব্যাপারে তাদের কর্তব্যকে উপেক্ষা করছেন।তারা এখনকার সমাজকে অন্ধকারাচ্ছন্ন করা বস্তুবাদী ও ধর্মহীনতার শক্তিদ্বারা প্রভাবিত হয়ে পড়েছেন। তারা আধুনিক প্রযুক্তির বিষাক্ত প্রভাবের শকার হয়েছেন এবং সর্বশক্তিমান আল্লাহর সাথে তাদের বন্ধন গড়ে তোলার চেষ্টা বা তাদের আধ্যাত্মিক ও নৈতিক মানকে বাড়ানোর চেয়ে নিরর্থক ও অগভীর (স্থূল) বিষয়ে অনেক বেশি সময় ব্যয় করছেন।

আমাদের প্রত্যেকেই জানে যে, বস্তুবাদিতা এবং অনৈতিকতাকে উৎসাহিত করে এমন বিষয়সমূহ দেখার তুলনায় আমরা ধর্মীয় অনুষ্ঠানগুলো দেখার জন্য কিংবা ধর্মীয় বইপুস্তক পাঠের জন্য কতোটা সময় ব্যয় করছি। সর্বশক্তিমান আল্লাহ্ এই যুগে আমাদেরকে এমটিএ (মুসলিম টেলিভিশন আহমদীয়া ইন্টারন্যাশনাল- আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের অফিসিয়াল টেলিভিশন স্টেশন) প্রদান করে আশীর্বাদপুষ্ট করেছেন, যেখানে এমন অনেক অনুষ্ঠান রয়েছে যা একজন ব্যক্তির ধর্মীয় জ্ঞান বৃদ্ধি করে। তাই লাজনা ইমাইল্লাহর সদস্যাদেরকে অবশ্যই যথাসম্ভব এটি দেখতে হবে এবং এর পাশাপাশি তাদের পরিবারের সদস্যরাও এথেকে উপকৃত হচ্ছে কিনা সেটাও নিশ্চিত করার জন্য প্রচেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে।

সন্দেহাতীতভাবেই, নারীরা সমাজে এক অপরিহার্য ভূমিকা পালন করে থাকেন। কারণ, ভবিষ্যত প্রজন্ম তাদের কোলে লালিত-পালিত হয় এবং তাদের কোমল যত্নে ও পরিচর্যায় বেড়ে উঠে। শুধুমাত্র এই বাস্তবতাই আহমদী নারীদের উপরে প্রদত্ত দায়িত্বকে আরও বাড়িয়ে দেয় যে, তারা যেন তাদের নৈতিক মানকে শক্তিশালী করার জন্য সেইসব অনুষ্ঠানগুলো দেখা নিশ্চিত করে কিংবা সে-সব বইগুলো পাঠ করে যা প্রতিশ্রুত মসীহ্ (আ.) কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত জামা'তে অন্তর্ভুক্ত হওয়ার উদ্দেশ্যকে পূরণে তাদেরকে সাহায্য করে।পরিষ্কার করে বললে, আমার বলার উদ্দেশ্য এটি নয় যে, আপনারা এমটিএ ছাড়া অন্য কোনো টেলিভিশন অনুষ্ঠানই দেখবেন না। তবে সে-সব অনুষ্ঠান দেখার চেষ্টা করুন যেগুলো আপনার জ্ঞান বৃদ্ধি করে কিংবা আপনার প্রতিদিনের জীবনে যা উপকারী। মনকে চাপমুক্ত করার জন্য কিছু হালকা বিনোদনপূর্ণ অনুষ্ঠান দেখা যেতে পারে; কিন্তু, যে-সব অনুষ্ঠানে গর্হিত ও অশ্লীল বিষয়াদিকে উৎসাহিত করা হয় সেগুলো আপনাদের অবশ্যই এড়ানো উচিত।

প্রাসঙ্গিক বিষয় হিসেবে, দর্শকের আগ্রহ বাড়াতে এবং জামা'তের নৈতিক ও ধর্মীয় প্রশিক্ষণকে এগিয়ে নেওয়ার জন্য কী ধরনের নতুন নতুন অনুষ্ঠান তৈরি করা যায়, এ ব্যাপারে এমটিএ সর্বদা প্রতিক্রিয়া ও পরামর্শের সন্ধান করে থাকে। আমাদের লাজনা সদস্যাদের অনেক ভালভাল চিন্তা রয়েছে আর তাই এবিষয়ে তাদের যে-কোনো মন্তব্য ও প্রতিক্রিয়া পাঠানো উচিত।

যাহোক, মূল কথায় ফিরে আসি। আমি অতীতে উল্লেখ করেছি, পশ্চিমা বিশ্বে বসবাসকারী জামা'তের সদস্যদের মাঝে কতো আহমদী কিংবা তাদের বাবা-মা কিংবা দাদা-দাদী পাকিস্তান থেকে অভিবাসনের জন্য চলে এসেছেন নিজ দেশে ধর্মীয় স্বাধীনতা থেকে বঞ্চিত হওয়ার কারণে। তবে, এদেশে ধর্মীয় স্বাধীনতা অর্জন করা সত্ত্বেও তারা তাদের ধর্ম-বিশ্বাসের অনুশীলন করেন না, তাদের ধর্মীয় বাধ্যবাধকতাগুলো অবহেলা করেন এবং আধুনিক বিশ্বের বস্তুগত ধ্যান-ধারণার শিকারে পরিণত হন। তাই এটি বলা যায় না যে, তাদের অভিবাসনের উদ্দেশ্য পূরণ হয়েছে।অথবা, এটাও বলা যায় না যে, মুসলমান হিসেবে তাদের বিশ্বাস প্রকাশ্যে অনুশীলন করার আকাঙ্ক্ষার যে দাবি তারা করেছিলেন তা তারা সত্য সাব্যস্ত করেছেন। সেই বিচারে, প্রত্যেক [অভিবাসী] আহমদী নারীর এটা স্বীকার করতে প্রস্তুত থাকা উচিত যে, তারা তাদের ধর্মের দোহাই দিয়ে এখানে এসেছিলেন এবং সেজন্য তাদের নিজেদের ধর্ম-বিশ্বাস এবং তাদের সন্তানদের ধর্ম-বিশ্বাসও দৃঢ় এবং অবিচল রাখাটা অবশ্যই সুনিশ্চিত করতে হবে। এছাড়াও, আপনাদের সেই জাতির প্রতি কৃতজ্ঞ হওয়া উচিত, যারা আপনাদেরকে আশ্রয় দিয়েছে এবং প্রকৃত কৃতজ্ঞতা প্রদর্শনের উপায় হলো, স্থানীয় মানুষদেরকে সর্বশক্তিমান আল্লাহর দিকে নিয়ে আসার জন্য প্রচেষ্টা চালানো।বরং এর পরিবর্তে, আমাদের জামা'তের সদস্যরা স্বাধীনতা ও সমৃদ্ধির নামে, এখনকার সমাজের অনৈতিক কর্মকাণ্ডে নিমগ্ন হয়ে পড়ছে। আমাদেরকে অবশ্যই তাদের ধ্বংসকর সুদূর প্রসারী পরিণামগুলো থেকে বাঁচাতে হবে এবং অন্যদেরকেও রক্ষা করার জন্য চেষ্টা করতে হবে।

আধ্যাত্মিকতা ও নৈতিকতা-শূন্য এসব নীচু পথ থেকে নিজেদেরকে রক্ষা করুন; কারণ, এগুলো কেবল আপনারই ক্ষতি করবে না; বরং, ভবিষ্যত প্রজন্মকেও ধ্বংস করবে।এর অর্থএই নয় যে, যে সমাজে আপনি বাস করছেন সেখানে আপনি একীভূত হবেন না বা অবদান রাখবেন না। অনেক আহমদী এখানে বেড়ে উঠেছেন বা কয়েক দশক ধরে এখানে বসবাস করছেন এবং এখন তারা ব্রিটিশ রীতিনীতি এবং মূল্যবোধের সাথে পুরোপুরি সুর মিলিয়ে চলতে পারছেন এবং তারা নিজেরাই এখন এই সমাজের একটি অবিচ্ছেদ্য অঙ্গে পরিণত হয়েছেন। এতে কোনো সমস্যা নেই। এর বিপরীতে, প্রত্যেক ব্যক্তি, এখানে জন্মগ্রহণ করা হোক বা অভিবাসী যা-ই হোক না কেন, সমাজের একজন সদস্য হিসেবে একীভূত হওয়ার জন্য এবং নিজ দায়িত্ব পালনের জন্য তাদের প্রচেষ্টা চালানো উচিত এবং এই জাতির বিশ্বস্ত ও অনুগত নাগরিক হওয়া উচিত। আমাদের ধর্ম-বিশ্বাসের প্রয়োজনীয় শর্ত হিসেবে, মুসলমানদের উচিত তাদের দক্ষতা ও সামর্থ্যকে, তারা যেখানে বসবাস করছেন, সেই জাতির কল্যাণে ব্যবহার করা এবংতাদের অগ্রগতি ও উন্নয়নের জন্য কাজ করা।

তাছাড়া, স্থানীয় রীতিনীতি ও প্রথাগুলো পর্যবেক্ষণ করা ও সেগুলো থেকে শিক্ষা গ্রহণ করা একটি উত্তম বিষয়; যতক্ষণ ইসলামের শিক্ষার সাথে সেগুলো সাংঘর্ষিক না হয়। সোজা কথায় বলতে গেলে, একজন আহমদীর স্মরণ রাখা উচিত যে, তিনি তার আশেপাশের পরিবেশের দ্বারা এতোটাই মগ্ন বা পরিচালিত হবেন না যে, তার মূল ধর্মীয় শিক্ষাকে তিনি ভুলে যাবেন কিংবা ইসলামী শিক্ষানুসারে তিনি সন্তানদেরকে প্রশিক্ষণ দেওয়ার দায়িত্বকে উপেক্ষা করবেন।

নিঃসন্দেহে, যারা তাদের ধর্মীয় মূল্যবোধগুলো বাঁচাতে এবং সংরক্ষণ করতে ব্যর্থ হন, তারা সেই ব্যক্তি যারা তাদের অঙ্গীকারগুলো পূরণে ব্যর্থ হন। এই উন্নত দেশগুলোতে স্বাধিকার ও ব্যক্তি-স্বাধীনতার নামে নৈতিক মূল্যবোধগুলো দিনদিন হ্রাস পাচ্ছে। আমাদের কিছু আহমদী মহিলা এবং মেয়েরাও এগুলোর দ্বারা নেতিবাচকভাবে প্রভাবিত হচ্ছেন। কিন্তু, তাদের বুঝতে হবে যে, এই ধরনের তথাকথিত স্বাধীনতা, তাদের জাতির সাফল্য ও অগ্রগতির সাথে কোনো সম্পর্ক রাখে না।

এটা কি বলা যেতে পারে যে, নাইটক্লাবগুলোতে এমনভাবে পোশাক পরিধান করে যাওয়া, যাতে আপনার দেহের প্রায় সমস্ত অংশই উন্মোচিত হয়ে যায় এবং পুরুষদের সাথে নাচা এমন কোনো কাজ, যা একটি দেশকে উন্নত ও সফল হতে সাহায্য করবে? অবশ্যই না।

এটা কি বলা যেতে পারে যে, মদপান করে নিজের জ্ঞান হারিয়ে ফেলা এবং নির্লজ্জ আচরণ করা এমন একটি বিষয় যা আপনার দেশের উন্নতি সাধন করবে?এ আচরণ কি জাতির প্রতি একজনের সেবা হিসেবে বিবেচিত হতে পারে? অবশ্যই না!এগুলো মাত্র গুটিকয়েক উদাহরণ এবং এই সমাজে আরও অনেক এমন ক্ষতিকারক বিষয় প্রচলিত রয়েছে, ধর্মনিরপেক্ষ লোকেরা পছন্দের স্বাধীনতা বা অগ্রগতির নামে যেগুলোর যথার্থতা সাব্যস্ত করার চেষ্টা করে। কিন্তু, সর্বশক্তিমান আল্লাহ্ এবং তাঁর রসূল (সা.) এগুলোকে অশ্লীল বলে ঘোষণা করেছেন এবং এগুলো মানবজাতিকে তার স্রষ্টা থেকে দূরে সরিয়ে নেয়। যদিও এই বিষয়গুলিকে একটি মুক্ত এবং আধুনিক সমাজের উদাহরণ হিসেবে সামনে তুলে ধরা হয়, তথাপি বাস্তব তাহলো, এ জাতীয় ভ্রান্ত কার্যকলাপ কেবল সেই ভিত্তিগুলোকেই ছিন্নভিন্ন করতে সাহায্য করে যার ওপর সত্যিকারের একটি সমৃদ্ধ ও পারস্পরিক সহানুভূতিশীল সমাজ প্রতিষ্ঠিত হয়।স্বাধীনতার নামে একটি

যুগ ইমামের বাণী

স্মরণ রেখো! কাজ তারাই করতে পারে, অর্থাৎ ধর্মের সেবা তারাই করতে পারে যাদের মধ্যে স্বর্গীয় জ্যোতি বিদ্যমান।

(মালফুযাত, ১ম খণ্ড, পৃ: ৪৩)

দোয়াপ্রার্থী: Jahanara Begum, Bhagbangola, (Murshidabad)

সমাজের নৈতিক মানকে অবনমিত বা নিচু করার বিষয়টি, সভ্যতার শক্তি বা ঐক্যকে সামগ্রিকভাবে ক্ষুণ্ন করার পাশাপাশি সেই সমাজে বসবাসকারী লোকদেরকে পৃথক পৃথকভাবে ক্ষতি করে। এটা পরিষ্কার করা দরকার যে, এমন একটি সময় অবশ্যই আসবে যখন এই উন্নত দেশগুলোর মানুষ বুঝতে পারবে যে, তারা যেগুলিকে স্বাধীনতা বলে মনে করেছিল সেগুলি আসলে তাদের ধ্বংসের কারণ ছিল।

এখন আমরা এমন এক পর্যায়ে পৌঁছেছি, যেখানে এমনকি কিছু অমুসলিম পর্যন্ত তাদের সমাজের মধ্যকার নির্লজ্জতা ও অশ্লীলতার চরম স্তর নিয়ে নিন্দা করছে এবং তারা স্বীকার করে যে, সাধারণ মানুষের মধ্যকার হতাশা ও উদ্বেগ বৃদ্ধির বিষয়টির সঙ্গে নৈতিকতার অবক্ষয়ের সরাসরি সম্পর্ক রয়েছে। আর তাই, আপনাদের নিজেদের ধর্ম-বিশ্বাসের চর্চা ও অনুশীলনের ক্ষেত্রে সত্যিকার অর্থে কোনো প্রকারের হীনমন্যতা বা বিব্রতবোধ করার একে বারে কোন কারণ নেই।

পার্থিব লোকেরা দাবি করতে পারে যে, কারও দেহ অনাবৃত করে প্রদর্শন করা, ইঙ্গিতপূর্ণ পোশাক পরিধান করা কিংবা

জনসাধারণের মাঝে যৌনতাপূর্ণ আচরণ করা একটি প্রগতিশীল সমাজের এবং এমন এক সমাজের লক্ষণ বা চিহ্ন যেখানে মত প্রকাশের স্বাধীনতার মূল্যায়ন করা হয়। তবে, তারা এরচেয়ে বেশি ভ্রমাত্মক হতে পারতো না। সমস্ত আহমদী, তারা নারীপুরুষ, যুবক বা বৃদ্ধ সে যা-ই হোক না কেন, ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকে তাদের অবশ্যই বুঝতে হবে যে, এগুলো অনৈতিকতার চরম শিখর আর ধার্মিক লোকেরা, যারা ধর্মকে পার্থিবতার উপরে প্রাধান্য দেওয়ার অঙ্গীকার করে থাকেন, তারা এসব সহ্য করতে পারেন না।

সুতরাং, পশ্চিমা বিশ্বে বসবাসকারী আহমদী মুসলমানদের, সমাজের এসব অকল্যাণ থেকে নিজেদেরকে রক্ষা করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। যেমনটি আমি আগেই বলেছি যে, আপনাদের কেবল নিজেকেই রক্ষা করলে হবে না; বরং অন্যদেরকেও নৈতিক অবক্ষয় থেকে রক্ষার জন্য প্রচেষ্টা চালানো উচিত এবং সদগুণাবলী ও নৈতিকতা তুলে ধরা উচিত। এভাবেই আপনার জাতির সেবা করতে পারবেন এবং যদি আপনি এই প্রয়াসে আন্তরিক হন, তবে নিশ্চিত হন যে, প্রতিটি পদক্ষেপে আল্লাহর সাহায্য এবং করুণা আপনার সাথে থাকবে।

আজকের বিশ্বে মানসিক স্বাস্থ্য ও মানসিক সুস্থতার গুরুত্ব নিয়ে অনেক কিছুই বলা হয়। এক্ষেত্রে সর্বদা মনে রাখবেন যে, সত্যিকারের মনের শান্তি মহান আল্লাহ্ তা'লার নৈকট্য লাভের মাধ্যমে পাওয়া যায় এবং দুনিয়ার তুচ্ছ, হালকা এবং নিষ্ফল আকর্ষণের পিছনে ছুটে নয়। পবিত্র কুরআনের ১৩ নম্বর সূরার ২৯ নম্বর আয়াতে এই বিষয়ে বলা হয়েছে। সেখানে সর্বশক্তিমান আল্লাহ্ সুস্পষ্টভাবে বলে দিয়েছেন:

"মনে রেখো! আল্লাহ্‌র স্মরণেই হৃদয় প্রশান্তি লাভ করে।" [আর রা'দ, ১৩: ২৯ আয়াত]

এখানে সর্বশক্তিমান আল্লাহ্ সুস্পষ্টভাবে পরিষ্কার করে দিয়েছেন যে, একজন ব্যক্তির শান্তি ও স্বাচ্ছন্দ্য অর্জন করতে হলে তাকে অবশ্যই তার সৃষ্টিকর্তাকে স্মরণ করতে হবে। এটি পবিত্র কুরআনের, না'উযুবিল্লাহ্ (আমি আল্লাহর কাছে এথেকে আশ্রয় চাই) একটি ভিত্তিহীন দাবি নয়। বস্তুত, এর সত্যতা ঐতিহাসিকভাবে প্রমাণিত। আল্লাহর সমস্ত নবী এবং লক্ষ লক্ষ আন্তরিক বিশ্বাসীদের জীবন এই সত্যের সাক্ষ্য দেয় যে, একমাত্র মহান আল্লাহর স্মরণ ও ইবাদতের মাধ্যমেই সত্যিকারের মনের শান্তি অর্জন করা যায়।

অতএব, ভাববেন না যে, আধুনিক বিশ্বের তথাকথিত স্বাধীনতা বা পার্থিব জীবনধারা কোনো ব্যক্তির হৃদয়ের প্রশান্তিকে অনুপ্রাণিত করতে পারে; বরং, এটি আল্লাহরই স্মরণ, যা একজন ব্যক্তিকে সত্য ও স্থায়ী তৃপ্তির দিকে উৎসাহিত করে। বাস্তবতা হলো, ধার্মিক লোকেরা যখনই সর্বশক্তিমান আল্লাহকে স্মরণ করে, তাঁর নেয়ামত ও সৃষ্টির সৌন্দর্যের বিষয়ে চিন্তাভাবনা করে, তখনই তারা তাদের অন্তরে সন্তুষ্টি ও আনন্দ অনুভব করে।উদাহরণস্বরূপ, তারা বৃক্ষরাজি ও বনাঞ্চল অতিক্রম করার সময় আল্লাহ্‌র গৌরব ও মহিমা অনুধাবন করে। বিশাল মহাসাগর এবং হ্রদ কিংবা দ্যুতিময় পর্বতমালা পর্যবেক্ষণ করতে গিয়েও তারা তাঁর মহিমা উপলব্ধি করে। প্রকৃতির সৌন্দর্য এবং নিখুঁত ঐক্যতান দেখে তারা কেবল আল্লাহ্‌র প্রশংসা ও প্রশস্তি করতেই উদ্বুদ্ধ হয় না; বরং, এর পাশাপাশি তারা তাঁর অসীম ক্ষমতা নিয়েও চিন্তাভাবনা করে এবং কীভাবে তিনি এই আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী এবং মহাবিশ্বকে ঘিরে রাখা সবকিছুকে সৃষ্টি করেছেন সে-সব নিয়ে ভাবে।যা-ইহোক, যে মূল বিষয়টি আমি বলতে চাই তাহলো সর্বশক্তিমান আল্লাহ্ বলেছেন,

পার্থিব স্বাধীনতার মাধ্যমে কিংবা পার্থিব অর্থহীন আকর্ষণগুলোতে অংশ নিয়ে সত্যিকারের মনের শান্তি লাভ করা যায় না; বরং, সর্বশক্তিমান আল্লাহর নৈকট্যলাভ এবং সর্বদা তাঁকে আপনার হৃদয় ও মনের মধ্যে রেখেই তা অর্জন করা যায়। মনে রাখবেন, ইসলাম একটি মধ্যমপন্থা ও ভারসাম্যের ধর্ম। এটি বলেনা যে, আমাদেরকে অবশ্যই নিজেকে বিচ্ছিন্ন করতে হবে বা সমস্ত পার্থিব কাজকে পরিত্যাগ করতে হবে। এর পরিবর্তে, সর্বশক্তিমান আল্লাহ্ আমাদেরকে পৃথিবীতে বিদ্যমান স্বাচ্ছন্দ্য ও স্বস্তিদায়ক উপায়-উপকরণগুলোর মাধ্যমে উপকৃত হওয়ার এবং সেগুলো কাজে লাগানোর আদেশ দিয়েছেন।

আমাদের স্বাস্থ্যের পক্ষে ভাল বা আমাদের ব্যক্তিগত আগ্রহের সাথে সম্পর্কযুক্ত এমন পার্থিব বা বিনোদনমূলক ক্রিয়াকলাপগুলো অনুসরণ করার মধ্যে কোনো ক্ষতি নেই। তবে, এগুলো আমাদের অস্তিত্বের ওপর প্রভুত্ব করবে বা আমাদের জীবনের উদ্দেশ্য হয়ে উঠবে- এটি কখনই হতে দেওয়া উচিত নয়। সর্বশক্তিমান আল্লাহকে স্মরণ করা বা তাঁর নৈকট্য অর্জন করার মতো প্রধানতম লক্ষ্য থেকে এগুলো যেন আমাদেরকে কখনই বিচ্যুত করতে না পারে- তা অবশ্যই দেখা উচিত। পার্থিবতার অনুসরণ করাকে কখনই পরিত্রাণ বা সফলতার মাধ্যম হিসেবে বিবেচনা করবেন না। আর, এটাও নিশ্চিত যে, আল্লাহর অনুগ্রহ ও করুণা ব্যতীত, এমনকি আপাতদৃষ্টিতে ভাল বিষয়গুলোও বিপদজনক বলে প্রমাণিত হতে পারে।

উদাহরণস্বরূপ, লবণাক্ত পানি কখনই কোনো ব্যক্তির তৃষ্ণা নিবারণ করবে না। বরং, এটি তাকে আরও তৃষ্ণার্ত করে তুলবে এবং যদি সে নির্বোধভাবে এটা পান করতে থাকে, তাহলে সে অসুস্থ হয়ে পড়বে এবং পরিণামে মারা যাবে। ফলস্বরূপ, পানি জীবন রক্ষার উপকরণ হলেও, এটি যদি অসঙ্গতভাবে ব্যবহৃত হয়, তবে তা আমাদের মৃত্যুর কারণ হতে পারে। আমরা সকলেই অবগত যে, যখন বৃষ্টিপাত হয়, তখন মাটি উর্বর ও সজীবতা লাভ করে। কিন্তু, খরা হলে জমি শুষ্ক ও অনুর্বর হয়ে যায় এবং ঘাস শুকিয়ে যায়। যদিও আমরা তুলনামূলকভাবে একটি শীতল দেশে বসবাস করি, তবে সাম্প্রতিক বছরগুলোতে গ্রীষ্মের তাপমাত্রা বাড়ছে, আর তাই, এখানেও আমরা দেখি যে, কীভাবে ঘাস তার সবুজ রং হারিয়ে ফেলে এবং গরম ও শুকনো মৌসুমে শুকিয়ে যায়।

সেই দেশগুলোতে, যেখানে জলবায়ু ধারাবাহিকভাবে উষ্ণ থাকে এবং খরার শিকার হয়, ঘাস সম্পূর্ণরূপে মরে যায় এবং প্রাণী ও অন্যান্য জৈব-সত্তাগুলো ধ্বংস হতে শুরু করে। সুতরাং, পানির মূল্য সীমাহীন ও অতুলনীয় এবং এর প্রকৃত মূল্য কেবল তখনই লক্ষ্য করা যায় যখন আমরা এটা থেকে বঞ্চিত থাকি বা এটি যখন দূষিত হয়ে যায়। অনুরূপভাবে, যদি কোনো ব্যক্তি সর্বশক্তিমান আল্লাহ্‌র অনুগ্রহরাজিকে উপেক্ষা করে এবং পাপময় আচরণকে জীবনের পানিস্বরূপ বিবেচনা করে, তবে সে ব্যর্থতা ও হতাশার পাঁকে নিপতিত হবে।

সর্বশক্তিমান আল্লাহ্ তা'লা নবীগণের আবির্ভাব এবং যে শিক্ষা তারা নিয়ে আসেন তা মানবতার জন্য আধ্যাত্মিক পানি হিসেবে সাব্যস্ত করেছেন; কারণ, তাঁদের আধ্যাত্মিক এই পানির মাধ্যমে আমাদের আত্মাগুলি পবিত্র হয় এবং পুরিপুষ্ট হয়। যদি আমরা তাঁদের শিক্ষা গ্রহণ করি তবে আমাদের জীবনে সাফল্য লাভের বিষয়টি নিয়তি নির্ধারিত। তথাপি, যদি আমরা তাঁদের শিক্ষাকে প্রত্যাখ্যান করি বা অনৈতিক আচরণ করি, তাহলে আমাদের জন্য তা তাঁদের আধ্যাত্মিক পানি প্রত্যাখ্যান করে এর পরিবর্তে পার্থিব লবণাক্ত পানিকে গ্রহণ করা হবে, যা কখনই আমাদের তৃষ্ণা নিবারণ করবে না এবং শেষ পর্যন্ত আমাদেরকে ধ্বংসের দিকে নিয়ে যাবে।

কখনও ভুলে যাবেন না যে, আমরা আহমদীরা সবচেয়ে ভাগ্যবান মানুষ; কারণ, আমরা এই যুগে প্রতিশ্রুত মসীহ্ (আ.)-এর দ্বারা বিশ্বকে প্রদত্ত আধ্যাত্মিক পানির প্রত্যক্ষ গ্রহণকারী। তাকে গ্রহণ করার পরেও, আমরা যদি অনৈতিকতার পথে চলতে থাকি এবং সর্বশক্তিমান আল্লাহর নির্দেশাবলী পালন করতে ব্যর্থ হই, তাহলে আমরা আমাদের নিজেদের জীবন ধ্বংস করতে থাকবো এবং সেই আধ্যাত্মিক পানি, যা আমাদের মুক্তি ও বিজয়ের উপায় হতে পারতো, তার স্থলে আমরা লবণাক্ত পানিকে বেছে নেওয়ার জন্য দোষী সাব্যস্ত হবো।আমি আরও একটি বিষয় উল্লেখ করতে চাই। তাহলো আমাদের কিছু সংখ্যক আহমদী পুরুষ এবং নারী, যাদের সাথে কিছু তরুণ-যুবকও আছেন,

মহানবী (সা.)-এর বাণী

আঁহযরত (সা.) বলেন- 'আমি আল্লাহ্ তা'লার নিকট 'লাওহে মাহফুয' এ সেই সময় খাতামান্নাবীঈন আখ্যায়িত হয়েছি যখন আদম সৃষ্টির উন্মেষ লগ্নে ছিলেন। (মুসনাদে আহমদ)

দোয়াপ্রার্থী: Shujauddin and Family , Barisha (Kolkata)

যদি আপনার মাঝে খোদা তা'লার তাকওয়া থাকে তবে আপনি সোজা পথ থেকে ছিটকে যাবেন না, মন্দ কাজ করবেন না, আপনি সবসময় খোদা তা'লার আদেশ মেনে চলবেন বিনয় অবলম্বন এবং ক্ষমা করার অভ্যাস গড়ে তোল। আর মানুষের মনে কারো প্রতি ঘৃণা থাকা উচিত নয়। এর জন্য আমরা আল্লাহ্ তা'লার নিকট ক্ষমাপ্রার্থনা করি।

আপনারা যদি প্রকৃত মুসলমান হন, তবে আপনাদের বন্ধু-বান্ধবদের বলা উচিত যে আমরা প্রকৃত মুসলমান,কেননা আমরা এক-অদ্বিতীয় সর্বশক্তিমান খোদার উপর ঈমান রাখেন এবং আঁ হযরত (সা.) কে খাতামান্নাবীঈন হিসেবে বিশ্বাস করি। আমরা তাঁকে শেষ নবী হিসেবে বিশ্বাস করি। আঁ হযরত (সা.)-এর ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী শেষ যুগে এক মহাপুরুষের আবির্ভারের কথা ছিল আমাদের বিশ্বাস, মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী হিসেবে তিনি এসে গেছেন। (যিনি প্রতিশ্রুত মসীহ ও মাহদী) তিনি আঁ হযরত (সা.)-এর উম্মতি নবী, যিনি তাঁরই অনুবর্তিতায় ও আনুগত্যে এসেছেন।

হযরত খলীফাতুল মসীহ আল খামিস (আই.) ২০২১ সালের ১৮ শে ডিসেম্বর ফিনল্যাণ্ডের ১০ উর্দ্ধ ওয়াকফে নও ছেলে ও মেয়েদের সঙ্গে অনলাইন সাক্ষাত করেন। সাক্ষাতানুষ্ঠানের প্রশ্নোত্তর পর্ব উপস্থাপন করা হল।

প্রশ্ন: যদি কোন ওয়াকফে নও পড়াশোনা ছেড়ে দেয় বা পড়াশোনা শেখ করে নিজের কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়ে এবং ওয়াকফে নও হিসেবে জামাতকে সে সব বিষয়ে অবগত না করে, তবে এমন ওয়াকফে নওদের বিষয়ে হুযুর কি উপদেশ করবেন?

হুযুর আনোয়ার বলেন, নীতিগতভাবে ওয়াকফে নওদের পিতামাতাদের বাচ্চাদের কানে একথা ঢুকিয়ে দেওয়া উচিত যে, যখন তারা পনেরো বছরে উপনীত হবে তখন তারা নিজেরাই জামাতকে বলবে এবং জামাতের সঙ্গে চুক্তির নবায়ন করবে। এবং অবগত করবে যে এখন সে পনেরো বছরে পদার্পন করেছে আর পড়াশোনা করছে এবং পড়াশোনা শেষ করে জামাতের সেবায় নিজেকে উপস্থাপন করবে। এরপর একুশ বাইশ বা তেইশ বছরে ইউনিভার্সিটির পড়াশোনা শেষ করে পুনরায় জানাতে হবে যে পড়াশোনা শেষ হয়েছে, অমুক অমুক কাজ শিখেছে এবং জামাতের জন্য সে কি করতে পারে। অতএব, নীতিগতভাবে এটি একটি চুক্তি যা পিতামাতা নিজেদের সন্তানের বিষয়ে জামাতের সঙ্গে সম্পাদন করে থাকে আর এই চুক্তি বা অঙ্গীকার পূর্ণ করা বাঞ্ছনীয়। এরপর বাচ্চাদের দায়িত্ব সেটি পূর্ণ করা। আর বাচ্চা যদি সেই কাজ বা জামাতের সেবা না করতে চায়, তবে সরাসরি লিখে জানিয়ে দিক যে তার পিতামাতা ওয়াকফ করেছিল কিন্তু পরিস্থিতির কারণে সে এখন নিজেকে ওয়াকফ করতে চায় না। তাই নীতিগতভাবে সততার দাবিও বটে যে, পড়াশোনা করে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর নিজের কাজের জন্য জামাতের অনুমতি নেওয়া, মরকযের কাছে জানতে চাওয়া যে পড়াশোনা শেষ করেছি, এখন নিজের কাজ করব না কি জামাত আমাকে কোন কাজে লাগাতে চায়। দেখা যায় মরকয প্রায় তাদের বলে দেয় এখন নিজের কাজ কর, আর যারা মাঝে পড়াশোনা ছেড়ে দেয়, অকর্মণ্য হয়ে থাকে,তাদের তো এমনিতেই ওয়াকফে নও ছেড়ে দেওয়া উচিত এবং জামাতকে জানিয়ে দেওয়া উচিত যে তারা আর পড়তে চায় না। কেননা আমাদের প্রয়োজন শিক্ষিত ওয়াকফে নও, অশিক্ষিতদের দিয়ে আমাদের কোজ কাজ হবে না। তাই সততার দাবি হল তাদেরকে অবগত করা, আর তোমাদের যে পিতামাতা অঙ্গীকার করেছিল সে অঙ্গীকারকে পূর্ণ করার জন্য ১৫ এবং ২১ বছর বয়সে বন্ড এর নবায়ন করা এবং এর উপর প্রতিষ্ঠিত থাকা।

প্রশ্ন: কিছু ওয়াকফে নও অস্থায়ী বা কাজের ভিসার নিয়ে এখানে থাকে আর এই সব দেশে থাকার জন্য কাজ করতে হয়। আমার প্রশ্ন হল তারা কিভাবে নিজেদেরকে ওয়াকফ হিসেবে উপস্থাপন করতে পারবে এবং জামাতের সেবা করতে পারবে?

হুযুর আনোয়ার বলেন: কেউ তো আর চব্বিশ ঘন্টা কাজ করায় না। কিছু না কিছু সময় তো পাওয়াই যায়। সপ্তাহান্তের ছুটি পাওয়া যায়। ওভার টাইম যোগ করে সপ্তান্তের ছুটিকেও তোমরা অর্থ উপার্জনের জন্য খরচ কর তবে লাভ কিছুই হবে না। তাই সপ্তাহে অন্তত একদিন জামাতের জন্য দেওয়া উচিত। একদিন ওভার টাইম করলাম আর একদিন জামাতকে দিলাম, জামাত যা কাজ নিতে চায় তা নেওয়ার অধিকার জামাতের আছে। এখানে আপনারা যখন এসেছিলেন, তখন তো ছাত্র হিসেবেই এসেছিলেন। পাকিস্তান থেকে স্টুডেন্ট ভিসা নিয়ে এসেছিলেন উচ্চ শিক্ষা অর্জনের জন্য বা সেখানে আপনাদের জন্য শিক্ষার সুযোগ ছিল না, সে কারণেই তো এসেছিলেন। শিক্ষার সুযোগ কেন ছিল না? (ছাত্রটি উত্তর দেয় যেভাবে এখানে আমরা শিক্ষা গ্রহণের স্বাধীনতা পাচ্ছি সেখানে তা পেতাম না) হুযুর আনোয়ার বলেন,স্বাধীনভাবে নিজেকে আহমদী হিসেবে পরিচয় দিতে পারেন সেখানে লুকিয়ে থাকতেন। এর অর্থ হল আপনি শরণার্থী হিসেবে আসুন বা ছাত্র হিসেবে, আহমদীয়াতের কারণেই আপনি এখানে আসতে পেরেছেন। কেননা পাকিস্তানে ধর্মীয় স্বাধীনতা ছিল না। অতএব, যে ধর্মের নামে আপনি এখানে এসেছিলেন তার কিছু অধিকার বর্তায়, সেই অধিকার প্রদান করুন। সপ্তাহের সাতটি দিনের মধ্যে একটি দিন তো দিতে পারেন ধর্মকে। সততা ও নৈতিকতার দাবি তো এটাই। এরপর আপনি যা খুশি করতে পারেন।

প্রশ্ন: কিছু মানুষ বলে, আমরা স্পষ্ট কথা বলি, তা সে কাউকে খারাপ লাগুক বা না লাগুক। এবং অনেক সময় এমন কথা বলে ফেলেন যার কারণে অন্যরা অনেক কষ্ট পায়। হুযুর! এই পদ্ধতি কি সঠিক?

হুযুর আনোয়ার বলেন: স্পষ্টবাদী হওয়া কোন কৃতিত্বের দাবি রাখে না। আরবের বেদুইনরাও স্পষ্টবাদী ছিল। আমরা তাদের কি নামে ডাকি? বেদুইন বলেই তো ডাকি। তারা শিক্ষিত নয়। যে বেদুইন হযরত উমর (রা.)-এর কাপড় থেকে টানত তাকে মহান সাহাবী তো আর বলি না। তাকে অজ্ঞ ও নির্বোধ বলেই মনে করি যে এমন কাণ্ড ঘটিয়েছিল। এটা হযরত উমর (রা.) সহনশীলতা বা পুণ্যবানদের সহনশীলতা ছিল যার কারণে তারা এই ধরণের আচরণ সহ্য করতেন কিম্বা আঁ হযরত (সা.)-এর গলায় চাদর দিয়ে যে ব্যক্তি টানতে শুরু করেছিল, সেও কি কোন বুদ্ধিমানের কাজ করেছিল? সেও তো পাগলের মতোই কাজ করেছিল। কিন্তু আঁ হযরত (সা.) সহ্য করেছেন। কারণ তারা অজ্ঞ ছিল, নির্বোধ ছিল আর পাগল ও নির্বোধদের অত্যাচার সহ্য করা উচিত। আর যতদূর তাঁর প্রশ্ন, তাদের মধ্যে সেই বুদ্ধিটুকুই নেই যে এমন ঠিকমত কথা বলতে পারে। কোন গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তির সামনে সম্মান দিয়ে কথা বলা বা সম্মানের সাথে তার কথার উত্তর দেওয়া, তার কথা বোঝার চেষ্টা করা- এসব তারা জানেই না। আর তাদেরকে বোঝানোর জন্য বললে নিজেদের অনেক বড় মনে করে আর ছোটদের বোঝাতে হলেও উচ্চ নৈতিকতার দাবি হল সদিচ্ছা নিয়ে বোঝানো উচিত এবং এমন সময় বোঝানো উচিত যখন সামনের জন্য বুঝতে পারে, বিপরীত প্রতিক্রিয়া যেন না দেখায়। কিছু যুবককে বড়দের মধ্যে অনেকে প্রকাশ্য মজলিসে কিছু বলে ফেলে। যেমনটি পাঞ্জাবীতে বলে তুমি অমুক করেছ, সেই কাজ করেছ। অনেক অযথা কথা বল,তোমরা এটা কেন করছ- এই সব বলে যে কোন বিষয়ে বকে দেয় যা যুবকদের উপর বিরূপ প্রভাব ফেলে। সে তখন বলে, আমাকে অপমানিত করেছে সকলের সামনে, আমি তার কথা মানব না। আর যদি কর্মকর্তা এমনটি করে থাকে তখন সে বলে আমি মসজিদেই যাব না। তাই এসব আচরণ তাদেরকে দূরে সরিয়ে দেয়, এগুলি মূর্খতাপূর্ণ আচরণ। তাই বোঝাতে হলে সব সময় সদিচ্ছা সহকারে বোঝানো উচিত, যেভাবে কেউ একান্তে নিয়ে গিয়ে নিজের সন্তানকে বোঝায় যে এটা খারাপ কথা। খুব কমই মানুষই সন্তানের এই আবেগ অনুভূতির প্রতি যত্নবান হয়। অনেকে এমনও আছে যারা নিজেদের বাচ্চাকেও লোকের সামনে বকে দেয়। .... এটা ঠিক না। যদি কোন যুবককে বোঝাতেই হয়,তবে উচিত হবে তার আত্মসম্মানের বিষয়ে সংবেদনশীল হওয়া। আর ছোটরা যদি বড়দের সঙ্গে কথা বলতে হয় তবে তারও উচিত শিষ্টাচার ও সম্মান বজায় রেখে কথা বলা । এমন যেন না হয় যে, অজ্ঞের মত মুখে যা এল তাই বকে চলে গেল আর সামনের জনের কোন কথাই শুনল না। আঁ হযরত (সা.) বলেছেন, উন্নত নৈতিকতা মানুষের মৌলিক গুণ।বিনম্রতার সাথে এক অপরের সাথে কথা বলা উচিত, অজ্ঞ বেদুইনদের মত মুখে যা এল তাই বলে দেওয়া উচিত নয়।

EDITOR
Tahir Ahmad Munir
Sub-editor: Mirza Safiul Alam
Mobile: +91 9 679 481 821
e-mail : Banglabadar@hotmail.com
website:www.akhbarbadrqadian.in
www.alislam.org/badr

REGISTERED WITH THE REGISTRAR OF NEWSPAPERS OF INDIA AT NO PUNBEN/ 2016 / 70524

সাপ্তাহিক **বদর** কাদিয়ান Weekly **BADAR** Qadian

Distt. Gurdaspur (Pb.) INDIA Qadian - 143516

POSTAL REG NO GDP- 43 / 2023 -2025 Vol-8 Thursday, 30 Nov, 2023 Issue No.48

MANAGER
SHAIKH MUJAHID AHMAD
Mob: +91 9915379255
e.mail:managerbadrqnd@gmail.com

ANNUAL SUBSCRIPTION : Rs. 600/- (Per Issue : Rs. 12/-) (WEIGHT: 20-50 gms/issue)

(১০ পাতার পর.....)

যারা ভাবেন যে, জামা'ত তাদের জীবনে অপ্রয়োজনীয় বাধা আরোপ করে থাকে এবং তাদের স্বাধীনতাকে খর্ব করে। যাইহোক, যদি তারা সচেতনতার সাথে এবং পক্ষপাতহীনভাবে তাকান, তারা বুঝতে পারবেন যে, জামা'ত তাদের ন্যায়সঙ্গত অধিকার বা স্বাধীনতাকে কোনোভাবেই, কোনো দিক দিয়েই খর্ব করছেনা; বরং, জামা'ত কেবলমাত্র ইসলামের শিক্ষা সমুন্নত রাখতে এবং সেই অনুসারে জামা'তের সদস্যদেরকে নৈতিকভাবে দিক-নির্দেশনা দেওয়ার জন্য কাজ করে। আমরা সকল আহমদীকে তাদের ধর্মের সত্য শিক্ষার ওপর ভিত্তি করে কাজ করার জন্য উৎসাহিত করতে চেষ্টা করি, যা সত্যিকারের স্বাধীনতা এবং মুক্তির মাধ্যম।

দুঃখজনকভাবে, এমন কয়েকজন আহমদী পুরুষ ও মহিলার কিছু ঘটনা রয়েছে, যারা বৃহত্তর সমাজের দ্বারা এতটাই প্রভাবিত হয়ে পড়েছিলেন যে, তারা তাদের বাড়িঘর ছেড়ে চলে গিয়েছিলেন এবং তাদের ধর্ম-বিশ্বাস ত্যাগ করেছিলেন। কিছু সময়ের জন্য, তারা নিজেদেরকে হয়তো বা স্বাধীন হিসেবে গণ্য করেছিলেন বা তারা যে স্বাধীনতা এবং স্বাদ উপভোগ চেয়েছিলেন তা অর্জন করেছেন বলে ভেবেছিলেন। তথাপি, পরবর্তীকালে, তাদের মধ্যে অনেকেই তাদের সিদ্ধান্তের জন্য অনুশোচনা করেছেন এবং জামা'ত ত্যাগ করার পর পুনরায় জামা'তে প্রবেশ করতে চেয়ে বিব্রত ও লজ্জিত হয়েছেন। তারা স্বীকার করেছেন যে, তারা যেটাকে স্বাধীন জীবন বলে ভেবেছিলেন সেটি এর বিপরীত সাব্যস্ত হয়েছিল এবং শীঘ্রই তারা বুঝতে পেরেছিলেন যে, তারা একটি ধ্বংসাত্মক এবং বিপদজনক পথে যাত্রা করেছিলেন।

সর্বদা স্মরণ রাখবেন যে, জীবনে কোনো সিদ্ধান্ত বা পদক্ষেপ গ্রহণের আগে, বিচক্ষণতা ও বুদ্ধিমত্তার প্রাথমিক দাবি পূরণ করে, এর ভাল-মন্দ দিকগুলো যত্নের সঙ্গে পরীক্ষা করতে হবে ও খতিয়ে দেখতে হবে। এটা নিঃসন্দেহে সর্বশক্তিমান আল্লাহরও শিক্ষা।

আমরা, যারা নিজেদেরকে আহমদী মুসলমান বলে আখ্যায়িত করে থাকি এবং প্রতিশ্রুত মসীহ্ (আ.)-কে মেনে নিয়েছি বলে দাবি করি, আমাদেরকে কেবলমাত্র বস্তুবাদী (ভাল-মন্দের) উপকার ও কুফলগুলির মূল্যায়ন করলেই হবে না; বরং কোনো সিদ্ধান্ত নেওয়ার বা নতুন পথ গ্রহণের আগে আধ্যাত্মিক ও ধর্মীয় উপকার বা ক্ষতিরও মূল্যায়ন করা উচিত। বস্তুগত লাভের পরিমাণ যা-ইহোক না কেন, ধর্মীয় শিক্ষার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ না হলে একজন সত্যিকার আহমদীকে এই জাতীয় বিষয়গুলি ত্যাগ করতে সর্বদা প্রস্তুত থাকা উচিত।

আমাদের আধ্যাত্মিক ও ধর্মীয় মূল্যবোধগুলোকে সর্বদা অগ্রাধিকার দেওয়া উচিত। কেননা, আমরা ঘোষণা এবং প্রতিজ্ঞা করি যে, আমরাই সেই লোক যারা চিরকাল জাগতিক সমস্ত বিষয়ের ওপর আমাদের ধর্মকে প্রাধান্য দিব।শেষ হওয়ার আগে, আমি আপনাদেরকে স্মরণ করিয়ে দিতে চাই যে, মহানবী (সা.) বলেছেন, শালীনতাবোধ আমাদের বিশ্বাসের একটি অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। সুতরাং, পশ্চিমা দেশে বাস করলেও, কোনো আহমদীর উচিত নয় সেই ধরনের ফ্যাশন এবং প্রবণতা অনুসরণ করা, যেগুলোকে ব্যাক্তি-স্বাধীনতার বাহানায় যথার্থতা দানের চেষ্টা করা হলেও প্রকৃতপক্ষে যেগুলো অনৈতিকতা ও নির্লজ্জতার মাধ্যম। আপনার শালীনতাকে সংরক্ষণের চেয়ে, শরীরকে উন্মোচিত করে দেওয়ার মতো হাল ফ্যাশনের ধারা আপনাদের গ্রহণ করা উচিত নয়। সর্বদা, আহমদী মহিলা ও মেয়েদের সেই ধরনের ফ্যাশন অনুসরণ করা উচিত যা শালীনতার সীমার মধ্যে থাকে এবং যার মাধ্যমে তাদের পবিত্রতা রক্ষিত হয়।

এটা পরিষ্কার হওয়া উচিত যে, প্রতিটি আহমদী মহিলা এবং মেয়ে, সম্মানজনকভাবে এবং শালীনতার নীতিমালা অনুযায়ী পোশাক পরবে এবং আচরণ করবে। কখনও কখনও কিছু আহমদী মহিলা ও মেয়েরা ফ্যাশনের খাতিরে তাদের মাথা, চুল অযথা এমনকি তাদের বক্ষদেশ ঢাকতেও ব্যর্থ হয়, আর এটি পরিপূর্ণভাবে তাদের ধর্ম-বিশ্বাসের দাবির পরিপন্থী।তদুপরি, কিছু মহিলা পর্দার নামে কোট পরেন, তবে তাদের কোটগুলো এতটাই আটোসাঁটো হয় যে, তা স্কিন-টাইট শার্টের সঙ্গে সাদৃশ্যপূর্ণ। এই জাতীয় কোটগুলো, যেগুলো কোনো ব্যক্তির শারীরিক বৈশিষ্ট্য প্রকাশ করে, তা কোনো মুসলমান মহিলা বা মেয়েদের পক্ষে উপযুক্ত নয়। এমন হওয়া উচিত যে, যে কোটগুলো আপনি পরিধান করেন সেগুলো যেন আপনার শরীরকে ঢেকে রাখে এবং আপনাদের স্কার্ফ বা ওড়না যেন যথাযথভাবে আপনাদের মাথা ঢেকে পরিধান করা হয়।সর্বদা আপনার পোশাক সম্পর্কে সচেতন থাকুন যেন কেউ আপনার শালীনতা নিয়ে কখনও কেউ কোনো প্রশ্ন করতে না পারে; এবং এই সত্যের জন্য গর্বিত হোন যে, একজন মুসলমান মহিলার সম্মান ও পবিত্রতা রক্ষার মাধ্যম হলো পর্দা। প্রত্যেক আহমদী নারী ও পুরুষের একটি পরিধি রয়েছে যার মধ্যে তাদের থাকার বাধ্যবাধকতা রয়েছে এবং সেই পরিধিটি হলো ইসলাম যা কিছু শেখায় কেবল তা-ই।

সুতরাং, আমাদের সীমাগুলো কোনো ব্যক্তির দ্বারা গৃহীত সিদ্ধান্ত নয়; বরং, এগুলো সর্বশক্তিমান আল্লাহ্ তা'লা কর্তৃক নির্ধারিত সিদ্ধান্ত। কিছু লোক মনে করেন যে, আহমদীয়াত ইসলামের চেয়ে কঠোরতর; কিন্তু, এটি ভুল। কারণ, আহমদীয়াত এবং ইসলাম এক এবং অভিন্ন বিষয়। পবিত্র কুরআনে খুবই স্পষ্টভাবে ইসলামে নির্দেশিত পর্দার মান সম্পর্কে উল্লেখ করা হয়েছে, আর তাই শালীনতার প্রয়োজনীয় মান কী, তা দেখার জন্য আপনার মনোযোগ সহকারে কুরআন পড়া উচিত।

প্রতিটি ক্ষেত্রেই আমাদেরকে পবিত্র কুরআনের শিক্ষাগুলো অনুসরণ করতে হবে এবং এটিকে আমাদের পথ-নির্দেশক আলো হিসেবে বিবেচনা করতে হবে।আমাদের অবশ্যই পবিত্র কুরআনে বর্ণিত ইবাদতের মান বজায় রাখতে হবে।পবিত্র কুরআনে প্রদত্ত আল্লাহ্ তা'লার স্মরণ করার পদ্ধতিগুলো আমাদেরকে অবশ্যই অনুসরণ করতে হবে।

আমাদের সর্বোচ্চ সামর্থ্য দিয়ে কুরআনের প্রতিটি নির্দেশ অবশ্যই গ্রহণ করতে হবে।তারপর আমরা সর্বশক্তিমান আল্লাহর পুরস্কার ও সান্নিধ্য অর্জন করবো এবং প্রতিশ্রুত মসীহ্ (আ.)-এর বয়আতের দাবি পূর্ণ করবো।

অন্যথায়, সমস্ত পার্থিব বিষয়ের ওপর আমাদের ধর্ম-বিশ্বাসকে প্রাধান্য দেওয়ার দাবি এবং এর খাতিরে আত্মত্যাগের সমস্ত

দাবি সত্য বিবর্জিত হবে এবং ফাঁপা ও অর্থহীন হয়ে উঠবে।সর্বশক্তিমান আল্লাহ্ তা'লা আপনাদের সবাইকে ইসলামের প্রকৃত শিক্ষার ওপর আমল করার এবং এটি অনুধাবন করার তৌফিক দান করুন যে, আপনাদের জীবনের আসল উদ্দেশ্য হলো সর্বশক্তিমান আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করা এবং এর জন্য সকল প্রকার ত্যাগের জন্য প্রস্তুত থাকা। আমীন।সর্বশক্তিমান আল্লাহ্ লাজনা ইমাইল্লাহ্কে সর্বক্ষেত্রে আশিসমণ্ডিত রাখুন।

মসীহ মওউদ (আ.)-এর বাণী

"সেই লোকগুলি তোমাদের আদর্শ যাদের সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'লা বলেন, 'কোন ব্যবসা, বানিজ্য ও কেনাবেচা তাদেরকে আল্লাহ্র যিকর বা স্মরণ থেকে বাধা দেয় না।" *(মালফুযাত, ৫ম খণ্ড, পৃ: ১০৪)*

দোয়াপ্রার্থী: **Nurjahan Begum, Kolkata (W.B)**

১২৮ তম বাৎসরিক জলসা কাদিয়ান

সৈয়্যেদনা হযরত আমীরুল মু'মিনিন খলিফাতুল মসীহ্ আল খামেস (আইঃ) ২০২২ সালের জলসা সালানা কাদিয়ানের জন্য অনুমতি প্রদান করেছেন। জলসার দিনগুলি হল ২৯, ৩০ ও ৩১ শে ডিসেম্বর ২০২৩ (শুক্র, শনি ও রবিবার)। জামাতের সদস্যগণ এখন থেকেই দোয়ার সাথে এই মোবারক জলসায় অংশ গ্রহণ করার উদ্দেশ্যে প্রস্তুতি আরম্ভ করে দিন। আল্লাহ্তা'লা আমাদের সকলকে এই ঐশী জলসা থেকে কল্যাণ মণ্ডিত হওয়ার তৌফিক দান করুন। এই জলসা সালানার সার্বিক সফলতার ও বরকত মণ্ডিত হওয়ার জন্য এবং হেদায়েতের কারণ হওয়ার জন্য দোয়ায় রত থাকুন। জাযাকুমুল্লাহ্ ওয়া আহ্সানুল জাযা।

(নাজির ইসলাহ ও ইরশাদ মারকাজিয়া, কাদিয়ান)

Printed & Published by: Jameel Ahmed Nasir on behalf of Nigran Board of Badar. Name of Owner: Nigran Board of Badar. And printed at Fazle-Umar Printing Press. Harchowal Road, Qadian, Distt. Gurdaspur-143516, Punjab. And published at office of Weekly Badar Mohallah - Ahmadiyya, Qadian Distt. Gsp-143516, Punjab. India. Editor: Tahir Ahmad Munir